বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কস
আধুনিক মনে কুসংস্কার
বসন্তরোগ ও শীতলা
'কুসংস্কার' বিরোধিতা কতোখানি বৈজ্ঞানিক
বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসঙ্গে

সপ্তম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা মে-জুন 1984 এক টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

সপ্তম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা

মে-জুন1984

চিঠিপত্র □ ধর্ম : মার্কস থেকে উদ্ধৃতি □ অলৌকিকতা বিজ্ঞান ও আমাদের মন। কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় □ বসন্তরোগ ও শীতলা। কুমারেশ মিত্র □ শীতলা ও গণতন্ত্র। সন্ধানী □ তথাকথিত 'কু'সংস্কার ও প্রচলিত কুসংস্কার (পুণর্মুদ্রণ)। অসীম চট্টোপাধ্যায় □ 'কু-সংস্কার' বিরোধিতা কোন পথে। সৌমেন গুহ □ জানবার কথা। রঞ্জন ভদ্র □ দৃষ্টিকোণ : বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসঙ্গে। জয়ন্ত ঘোষাল

প্রচ্ছদ : অতি দাস

সম্পাদকমন্ডলী

রবীন মজুমদার * রবীন চক্রবর্ত্তী * অভিজিৎ লাহিড়ী * সৌমেন গুহ * অসীম চট্টোপাধ্যায়

আমাদের উদ্দেশ্য

বিজ্ঞানসম্মত ভাবনার প্রসার □ বিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা □ বিজ্ঞানের জনস্বার্থবিরোধী চরিত্র ও অপপ্রয়োগের বিরোধিতা করা □ মানুষ সমাজ ও বিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা □ কাজের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক কাজের পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করা □

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায় □ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার পাঁচ টাকা □ ডাক যোগে—সাত টাকা □ প্রাতিষ্ঠানিক চাঁদা—পঁচিশ টাকা □ বাংলাদেশের জন্য—ভারতীয় টাকায় দশ টাকা □ বিদেশী গ্রাহকদের চাঁদা—বার্ষিক দশ ডলার □ এজেন্ট কমিশন—দশ কপির উপর পঁচিশ শতাংশ এবং একশ কপির উপর তেত্রিশ শতাংশ □ এজেন্সীর জন্য নীচের ঠিকানায় লিখুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

প্রতি সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় সেন্ট্রাল এভিনিউ ও বৌবাজার স্ট্রিটের সংযোগ-স্থলে বৌবাজার পোস্ট অফিসের বিপরীতে 52/9C বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-700012 ঠিকানায় দোতলায় ডি. এস. এন্টারপ্রাইজের ঘর □ ডাকে যোগাযোগের ঠিকানা—অভিজিৎ লাহিড়ী, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, কলকাতা-700064

চিঠিপত্র

কি চাইছেন বুঝলাম না

আপনাদের মার্চ-এপ্রিল 1984 সংখ্যায় ঘোষণা দেখলাম 'ধর্ম ও কল্পভাবনা' প্রসঙ্গে (আপনাদের ভাষায়, 'দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়') পাঠকদের কাছ থেকে লেখা আর পরামর্শ চেয়েছেন, কিন্তু একজন পাঠক হিসেবে বলছি, ঠিক কি ধরনের আলোচনা চাইছেন আপনারা আমি বুঝতে পারলাম না। ধর্ম ত' একটা বিরাট বিষয়। 'কল্পভাবনা' বলতে কি বোঝাতে চাইছেন ? ফ্যান্টাসী ? বন্ধনীর ভিতর লিখেছেন, রিলিজিয়ন্স্, মিথ্স, ফল্স কনশাসনেস। প্রথম দুটো না হয় বুঝলাম, তৃতীয়টা অন্যের মুখে বার কয়েক শুনেছি, কিন্তু কেউই বোঝাতে পারে নি জিনিসটা কি। একটু বুঝিয়ে দেবেন দয়া করে ? দেখবেন, আমরা বেশী বই-টই পড়ি নি—এমন কিছু বলবেন না যাতে মাথার অনেক উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়।

সুধাকর দত্ত। আগরপাড়া।

রিপোর্টধর্মী লেখা এত বেশী কেন

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'তে আপনারা রিপোর্টধর্মী লেখাকে এত প্রাধান্য দেন কেন ? আপনারা বোধ হয় ধরেই নেন যে সব পাঠকই 'গণ-বিজ্ঞান আন্দোলন', 'বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে খুব বেশী ভাবিত। আপনাদের মার্চ-এপ্রিল 1984 সংখ্যাটাই দেখুন না —অধিকাংশই এই একই ধরনের লেখা। একটা পত্রিকা থেকে পাঠক যদি বিভিন্ন স্বাদের নানা লেখা আশা করে তবে সেটা কি খুব অন্যায় হবে ? এটা জানবেন, আন্দোলনের চিন্তায় আপনাদের সব পাঠক বিনিদ্র রজনী যাপন করে না।

মৃন্ময় অধিকারী। বেহালা।

এ সংখ্যায় যা চেয়েছিলাম

গত সংখ্যায় যখন বেশ একটু আশা নিয়ে ঘোষণা করেছিলাম যে এই সংখ্যায় আমাদের আলোচ্য বিষয় থাকবে 'ধর্ম ও কল্পভাবনা' (রিলিজিয়ন্স্, মিথ্স, ফল্স কনশাসনেস) তখন অনেক বন্ধুরই ভুরু উত্তোলিত হয়েছিল। অল্প হেসে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'পারবে ত' ? আমাদের নিজেদের ভিতরও সংশয় ছিল, কারণ যে বিষয়টা ঘোষণা করেছিলাম তাতে আমরা নিজেরা সকলেই একান্ত অ্যামেচার। সকলেই বিষয়টার গভীরে গিয়ে ভালভাবে বুঝতে চাই, কিন্তু তার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি কারুরই বেশী নেই। তখন ভেবে-ছিলাম, আমাদের আশেপাশে বা অল্প দূরে যারা এই বিষয়ে জ্ঞান ও উপলব্ধির স্তরে কিছুটা এগিয়ে রয়েছেন তাদের কাছ থেকে লেখাপত্র নিয়ে আমরা সেটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করব। কিন্তু পরে বুঝলাম, এটুকুও ঠিকমত করার অবস্থানে আমরা ছিলাম না। একটা কারণ, দেখলাম, আমাদের যোগাযোগের পরিধির ভিতর ঠিক সেরকম কোনো ব্যক্তি নেই যিনি বা যারা 'বি-ও-বি'র মত একটা ছোট কাগজের জন্য সময় দিয়ে ভেবে-চিন্তে লেখা দেবেন। আর তার চেয়েও বড় কথা, আমরা ঠিক কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে চাইছি বিষয়টা নিয়ে, কাজে নেমে দেখলাম সে বিষয়ে আমরা নিজেরা পরিষ্কার নই।

আসলে যে ভাবনা থেকে পরিকল্পনাটা এসেছিল সেটা বলি। একটা জিনিস আমরা বি-ও-বি'র কর্মীরা ও গণবিজ্ঞান সংক্রান্ত অন্যান্য গ্রুপের কর্মীবন্ধুরা অনেকদিন ধরেই অনুভব করছিলাম। আমরা যখন বৈজ্ঞানিক মানসিকতার কথা বলছি, ধর্ম-কুসংস্কারের কথা বলছি, প্রচার অভিযানে নামছি, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করছি, তখন আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোথায় যেন আমরা আসল সমস্যাটাকে ছুঁতে পারছি না। আমরা যেটাকে ধর্ম-কুসংস্কারের অন্ধকার ব'লে ভাবছি, তার ভিতর যে মানুষজন রয়েছে তাদের সঙ্গে আমাদের বিরাট দূরত্ব থেকেই যাচ্ছে, সত্যিকারের কোনো যোগসূত্রই আমরা স্থাপন করতে পারছি না। এই যে যেটাকে আমরা ধর্ম বলছি, কুসংস্কার বলছি, মিথ্ বলছি, ফল্স কনশাসনেস বলছি, মানুষের জীবন, জীবিকা, মানসিকতার কত গভীরে যে তার শিকড়, মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে যে কিভাবে তা ওতপ্রোত হ'য়ে রয়েছে, তা বোধহয় আমরা ধরতেই পারছি না। ফলে বিজ্ঞানের কথা, যুক্তির কথা, যেগুলি আমরা বলছি তার বেশীর ভাগই মানুষের কাছে অর্থহীন হয়ে থাকছে। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত শুধু আমাদেরই নিজেদের একটা সূক্ষ্ম আত্মপ্রসাদ লাভের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে সেগুলি। বস্তুত এখানে এসে যাচ্ছে আমাদের নিজেদের মানসিকতার গঠনের প্রশ্ন—এইসব প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে আমাদের ভিতরকার কোন্ প্রবৃত্তি চরিতার্থ হতে চাইছে, সে প্রশ্ন। কেন সব সময়ই আমাদের সব প্রচেষ্টাতেই একটা একমুখী দাতা-গ্রহীতা সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রবণতা থেকে যাচ্ছে সে প্রশ্ন।

তাই অনেকদিন ধরেই আমাদের মনে হচ্ছিল, বিজ্ঞানবিরোধী মানসিকতা বলে যেটাকে আমরা চিহ্নিত করছি তার উৎসগুলিকে, মানুষের সামগ্রিক অস্তিত্বের ভিতর পরিব্যাপ্ত তার শিকড়গুলিকে আরো ভাল-ভাবে বোঝা দরকার, উপলব্ধি করা দরকার। শুধু আমরা কেন, অনেকেই এটা চাইছেন জানি। এটা করতে পারলে তবেই আমরা সচেতন হব, প্রতিটি মানুষের ভিতর, এমনকি আমাদের নিজেদের ভিতর, কত বিভিন্নভাবে কত বিচিত্র কল্পভাবনা কত গভীরে বাসা বেঁধে থাকে। তখন হয়ত আমাদের প্রচেষ্টাগুলি দাতা-গ্রহীতা সম্পর্ক ছাড়িয়ে সত্যিকারের পারস্পরিক সহায়তার রূপ নেবে—একটা ব্যাপক সামাজিক প্রচেষ্টায় পৌঁছবে।

এইরকম একটা ভাবনা থেকে পরিকল্পনাটা শুরু হয়েছিল। কিন্তু তারপর দেখা গেল এই ভাবনাকে আর একটু নির্দিষ্টতা না দিতে পারলে এর উপর ভিত্তি করে পত্রিকার একটা 'বিশেষ সংখ্যা' দাঁড় করানো যাচ্ছে

না। বুঝলাম আমরা নিজেরা একান্ত অ্যামেচার হলেও আমরাই যদি চেষ্টা চরিত্র করে বিষয়টা নিয়ে চর্চা করার কোনরকম একটা 'অ্যাপ্রোচ' ঠিক করতে পারি তবে হয়তো অন্যদের কাছ থেকে লেখা পাব, মতামত পাব।

তাই পরিকল্পনার ধাঁচটা পাল্টাতে হল। যে অনুভূতি থেকে ভাবনা শুরু হয়েছিল সেটিকে সম্মুখে রেখে বি-ও-বি'র এবং সমভাবনাসম্পন্ন গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যান্য কর্মীদের অনুরোধ করলাম, যে যেরকম ভাবছে, বুঝছে, সেভাবেই লেখা দিতে। সবগুলোকে সমন্বিত করে একটা সুসংহত কাঠামো দাঁড় করানোর চিন্তা মুলতুবী রইল। ফলে লেখাগুলির পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক তেমন কিছু থাকছে না। তবে ধর্ম-কুসংস্কার-মিথ ব্যাপারটাকে একটু গভীরে গিয়ে বোঝার চেষ্টা থাকছে সবগুলিতেই। বিভিন্ন বন্ধুর দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন। সবগুলিকেই আমরা রাখার চেষ্টা করছি। পরের সংখ্যাগুলিতেও রাখব। আশা করছি পাঠকদের ভিতর থেকেও অনেকে প্রচেষ্টার অংশীদার হবেন। দেখা যাক এভাবে কোথাও পেঁছতে পারি কি না আমরা।

এ সংখ্যায় যে লেখাগুলি থাকছে সে সম্পর্কে দু-একটি কথা। ধর্ম-মিথ্-কুসংস্কারকে বোঝার অনেক ধরনের অ্যাপ্রোচ রয়েছে। এর মনস্তাত্ত্বিক দিক রয়েছে—মানুষের মনের গঠনেরই কোনো গভীরের স্তরে মিথ্-কল্পভাবনার শিকড় প্রোথিত কিনা, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা। সমাজতাত্ত্বিক দিক রয়েছে—পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের ভিতর দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের কোন্ কোন্ ধরনের প্রয়োজন মেটাতে কোন্ কোন্ ধরনের আচার-অনুষ্ঠান-কল্পভাবনার জন্ম হয়েছে তার বিশ্লেষণ। আছে মার্কসবাদী বিচারভংগী, আছে অস্তিত্ববাদী (একজিস-টেনসিয়ালিস্ট) দৃষ্টিকোণ; এরকম অনেক কিছু। এ সংখ্যায় নানান অ্যাপ্রোচের ভিতর কয়েকটির আংশিক নমুনা থাকছে। 'ধর্ম ব্যাপক মানুষের আফিম' এই বহুল উদ্ধৃত উক্তিটি মার্কসের যে লেখায় রয়েছে তার একটি অংশ অনুবাদ করে দেওয়া হ'ল, ধর্ম সম্পকে মার্কসের চিন্তার বিভিন্ন উপাদানগুলির কিছুটা ইংগিত পাওয়ার উদ্দেশ্যে। 'অলৌকিকতা বিজ্ঞান ও আমাদের মন' লেখাটিতে আধুনিক মন কিভাবে নানান সফিস্টি-কেটেড কুসংস্কারে গ্রস্ত হয় সে ব্যাপারটিকে বুঝতে চাওয়া হয়েছে। 'বসন্ত রোগ ও শীতলা' শীতলার আবির্ভাব ও বিবর্তনের একটি ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা। 'তথাকথিত 'কু' সংস্কার এবং প্রচলিত কুসংস্কার' শীর্ষক পুণর্মুদ্রিত লেখাটির বক্তব্য, কু-সংস্কার অভিধাটির ভিতরই একটি ভুল দৃষ্টিকোণ রয়ে যাচ্ছে—নির্দিষ্ট পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মানুষ জীবননির্বাহের নানান প্রয়োজনে যে সব আচার-অনুষ্ঠান-ধারণার আশ্রয় নেয় তাকে অন্য পরিস্থিতির নিরিখে বিচার করে কুসংস্কার বলার যৌক্তিকতা কোথায়? 'কুসংস্কার বিরোধিতা কোন পথে' লেখায় এই মতকেই পূর্ণতর রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

অন্য কিছু প্রাসংগিক লেখা ও নিয়মিত বিভাগও থাকছে এ সংখ্যায়।

পরিবেশ ভাবনা

কেশোরাম রেয়ন কারখানা নিঃসৃত গ্যাসে ওই এলাকার মানুষজনের জীবন বিপর্যস্ত। দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ চলেছে এই অবস্থা। নানা ধরনের রোগের শিকার কারখানার কর্মী ও স্থানীয় মানুষ। জল মাটি গাছপালাও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

এ ব্যাপারে কারখানা কর্তৃপক্ষের কোন উদ্বেগ নেই। স্থানীয় মানুষদের বিক্ষোভ আন্দোলনের মুখে পড়লে নানান টেকনিক্যাল সমস্যার কথা বলেন তারা এবং আশ্বাস দেন সমাধানের চেষ্টা করার। কিন্তু কিছুই হয় না তারপর।

এখন প্রশ্ন সত্যই কি এর কোন সমাধান নেই? অথবা কারখানা কর্তৃপক্ষের ইচ্ছেই নেই সমাধানের?

এ প্রশ্ন রাখছি আমরা আমাদের নিজেদের কাছে, আপনাদের সকলের কাছে, কর্তৃপক্ষের কাছেও। পরিবেশ দূষণ সমস্যার সামগ্রিক সমাজতত্ত্ব রাজনীতি-অর্থনীতি নিয়ে ত' অনেকেই অনেক কথা বলছি। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সেমিনার করছি। কিন্তু নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট মানুষজনের নির্দিষ্ট একটি সমস্যা—এর কি হবে?

সম্প্রতি গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গ্রুপের কিছু কর্মী আর উৎসাহী কিছু ব্যক্তি স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে একসাথে সমস্যাটি নিয়ে ভাবনা চিন্তার চেষ্টা করছে। সামান্য কিছু চর্চা শুরু হয়েছে। আমরা চাইছি, এই সমস্যাটি নিয়ে আরো ব্যাপক মানুষ ভাবুন, এর সমাধানের চেষ্টায় এগিয়ে আসুন। সকলেই জানি, সমাধান মোটেই সহজ নয়। কিন্তু আমরা অন্তত আমাদের সহমর্মিতাটুকু নিয়ে এলাকার লোকেদের পাশে দাঁড়াই। জীর্ণ শরীর-মন নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে দীর্ঘদিন ধরে তারা একান্ত অসম যে লড়াইটুকু চালাচ্ছে তার সঙ্গে অন্তত কিছুটা যুক্ত হই।

মারাত্মক দূষণের শিকার কিছু মানুষ, যাদের না আছে আর্থিক সামর্থ্য, না আছে রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা, তারা বোধহয় এ প্রত্যাশাটুকু করতেই পারে আপনাদের কাছে, আমাদের সকলের কাছে।

সঃমঃ বি-ও-বি

ধর্ম : নিষ্পেষিত জীবের দীর্ঘশ্বাস

ধর্মবিরোধী সমালোচনার মূল কথা হল : মানুষ ধর্ম তৈরী করে, ধর্ম মানুষকে তৈরী করে না। আর সত্যিই, ধর্ম হ'ল আত্মসত্তা (self) সম্পর্কে সচেতনতা, এবং যে মানুষ নিজেকে খুঁজে পায় নি, অথবা যে নিজেকে আবার হারিয়ে ফেলেছে, তেমন মানুষের আত্ম-বোধ। তাছাড়া, মানুষ এই পৃথিবীটার বাইরের কোনো বিমূর্ত সত্তা নয়। মানুষ বলতে—মানুষের জগৎ, রাষ্ট্র, সমাজ। এই রাষ্ট্র, এই সমাজই ধর্ম সৃষ্টি করে—যে ধর্ম হ'ল জগৎ সম্পর্কে একটা উল্টান' চেতনা—কারণ এই জগৎটাই হ'ল একটা উল্টান জগৎ। ধর্ম হ'ল এই জগতের একটা ব্যাপক তত্ত্ব, এর সার্বিক সারমর্ম, সাধারণ মানুষের মনে এর যুক্তিপ্রকরণ, এর নৈতিক ছাড়পত্র,...এর সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপক ভিত্তি। এটা মানুষের কল্পনায় মানবিক সারসত্তার বাস্তবীভবন, যার প্রয়োজন হয় এই কারণে যে, মানবিক সারসত্তার কোনো যথার্থ বাস্তবীভবন মানুষ সম্মুখে দেখতে পায় না। ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই তাই পরোক্ষভাবে সেই জগৎটার বিরুদ্ধে লড়াই যার আত্মিক সুরভী হ'ল ধর্ম।

ধর্মীয় যন্ত্রণা একই সঙ্গে বাস্তব যন্ত্রণার প্রকাশ আর সেই বাস্তব যন্ত্রণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ধর্ম হ'ল নিষ্পেষিত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, আত্মিকতাবিহীন দুনিয়ার অন্তরাত্মা। এটা হ'ল ব্যাপক মানুষের আফিম।

মানুষের কল্পিত সুখবোধ যে ধর্ম, তাকে হটিয়ে দেওয়ার দাবী আসলে মানুষের সত্যিকারের সুখেরই দাবী। মানুষ তার সত্যিকারের পরিস্থিতি সম্পর্কে মোহবোধগুলিকে ত্যাগ করুক এই দাবী, আসলে যে পরিস্থিতিতে মোহবোধের প্রয়োজন দেখা দেয় সেই পরিস্থিতিকেই বদলে ফেলার দাবী।.....

মানুষের শৃংখল যে কল্পিত ফুলগুলি দিয়ে আচ্ছাদিত, সমালোচনা সেগুলিকে ছিঁড়ে সরিয়ে দিয়েছে এই উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, যে মানুষ মোহবোধের আরামটুকু থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধু শৃংখলটুকু প'রে থাকুক ; এই সমালোচনার আসল উদ্দেশ্য, যাতে মানুষ শৃংখল ছুঁড়ে ফেলে জীবন্ত ফুলগুলিকেই তুলে নিতে পারে।.....

কার্ল মার্কস

ইনট্রোডাকশন টু এ ক্রিটিক অভ হেগেল্‌স ফিলজফি অভ ল।

(ক্রিস্টোফার কডওয়েল, স্টাডিজ অ্যান্ড ফারদার স্টাডিজ ইন এ ডাইং কালচার, মান্থলী রিভিউ প্রেস, নিউ ইয়র্ক, 1971 ; ফারদার স্টাডিজ অংশে [পৃঃ 77] উদ্ধৃত।)

বিজ্ঞান বনাম ধর্ম

আইনস্টাইনের সম্মানে আয়োজিত এক ভোজসভায় বার্নার্ড শ' রহস্য করে ধর্ম আর বিজ্ঞানের ভিতর পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন এই বলে—

"ধর্ম সর্বদাই সঠিক। ধর্ম সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেয়, এবং এইভাবে জগৎ থেকে সমস্যা দূর করে। ধর্ম আমাদের নিশ্চয়তা দেয়, দেয় স্থায়িত্ব, শান্তি, দেয় পরমের সন্ধান। এটা আমাদেরকে রক্ষা করে প্রগতির হাত থেকে, যাকে আমরা সবাই ভয় করি। বিজ্ঞান কিন্তু ঠিক এর উল্টো। বিজ্ঞান সর্বদাই ভুল। দশটা নতুন সমস্যা সৃষ্টি না করে কখনো একটা সমস্যার সমাধান দেয় না বিজ্ঞান।"

বিজ্ঞানের অবদান : ভারতে

এদেশের স্কুল ছাত্ররা শীঘ্রই পুরস্কৃত হতে চলেছে বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদানে। প্রতিটি স্কুলে দেওয়া হবে একটি করে টি-ভি সেট। এ প্রসঙ্গে স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় প্রশ্ন তোলা হয়েছে, প্রতিটি স্কুলে যখন এখনো একটি করে ব্ল্যাকবোর্ড দেওয়া সম্ভব হয় নি, তখন টি-ভি সেট কি দেওয়া যাবে ?

ভারতীয় বিজ্ঞানের নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে যখন এই প্রশ্নের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তখন তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন।

'নেচার', খণ্ড 308, পৃঃ 582, 12 এপ্রিল, 1984

আধুনিক মনও নানান আধুনিক চেহারার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। বিজ্ঞানশিক্ষার পাশাপাশি এই কুসংস্কারগুলির সহাবস্থান ঘটে কি ভাবে?

অলৌকিকতা বিজ্ঞান ও আমাদের মন

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ববিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায় 18 অক্টোবর 1974 সংখ্যায় ইউরি গেলার-এর দূরস্থানে অবস্থিত কোন বস্তুর ছবি আঁকার অতীন্দ্রীয় ক্ষমতা নিয়ে পরীক্ষার বিষয়ে Targ এবং Puthoff নামে দুই পদার্থবিজ্ঞানীর একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। গেলারের মানসিক শক্তিতে চাবি বেঁকিয়ে দেবার একটা অনুষ্ঠান ইংল্যান্ডের টেলিভিশনে প্রচারের পর টেলিভিশন কেন্দ্রে দর্শকদের প্রচুর ফোন আসতে থাকে যে একই সময়ে তাদের বাড়ীতেও চাবি, ছুরি ইত্যাদি বেঁকে গিয়েছে। ঐ সময়ে গেলার যে ইংল্যাণ্ডেই ছিলেন না একথা জানিয়েও তাঁদের দমানো যায়নি। গেলারের অলৌকিক ক্ষমতার অসাধারণ প্রদর্শনী বহু কৃতী ব্যক্তি এমনকি কিছু বিজ্ঞানীকেও মুগ্ধ করেছিলো এবং পরামনোবিদ্যাকে (Parapsychology) নবজীবন দিয়েছিলো।

পরামনোবিদ্যা বলতে কী বোঝায়

পরামনোবিদ্যা বিষয়টি বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে কিনা এ নিয়ে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। পরামনোবিদ্যার বিবেচ্য বিষয় হলো যাবতীয় অলৌকিক ও অতীন্দ্রীয় ক্রিয়াকলাপ (Paranormal phenomena)। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য পরীক্ষামূলক ও পরিমাপযোগ্য (experimental and quantitative) পদ্ধতি ব্যবহার করে পরামনোবিদ্যা প্রচলিত ভৌত ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পরিধির বাইরের ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করে এবং বিশ্বাস করে যে তাদের অলৌকিক ঘটনার প্রদর্শনকে অন্যের পক্ষেও পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব (replicable)।

পরামনোবিদ্যা কি বিজ্ঞান ?

যদিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরামনোবিদ্যাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট হয়েছেন কিছু ব্যক্তি, তবু বেশীর ভাগ মনোবিজ্ঞানী একে বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে অধ্যাত্মবাদ বা মেকী বিজ্ঞান বলে মনে করেন। এর অন্যতম কারণ ইন্দ্রিয়-অনুভূতির ও চিন্তার আধুনিক শারীরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সংগে অতীন্দ্রীয় অনুভূতির (extra-sensory perception) কাহিনীগুলি সংগতিপূর্ণ নয়। পরামনোবিদ্যার ভিত্তি হোলো বস্তুর ওপর মনের ক্রিয়া অথবা এক মনের ওপর আরেক মনের ক্রিয়া। অপর পক্ষের বিজ্ঞানীরা মনে করেন মনন হোলো শারীরতাত্ত্বিক নিউরনজনিত প্রক্রিয়া, এর বাইরে মনের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। মস্তিষ্ক ও নিউরনের ওপর গবেষণা থেকে এ ধরনের ইংগিত পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক শৃংখলা ও অলৌকিকতা

"An enquiry concerning human understanding"-এ বিজ্ঞানী ডেভিড হিউম লিখেছেন—"অলৌকিক ক্রিয়া (miracle) হোলো প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী। দৃঢ় এবং অপরিবর্তনযোগ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই এই নিয়মগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই অলৌকিকের স্বপক্ষে কোন প্রমাণই যথেষ্ট নয়, যদি না সেই প্রমাণটি এমনই হয় যার বিপরীত সিদ্ধান্তটি মূল অলৌকিক ঘটনার থেকে আরো অবিশ্বাস্য হবে…"।

নিশ্চিত প্রমাণ নেই

বিজ্ঞানীদের অস্বীকৃতির দ্বিতীয় কারণ হোল এখনো পর্যন্ত এমন কোন তথ্য বা ঘটনা পাওয়া যায়নি যা অলৌকিকতাকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম। প্রবাদপুরুষ ইউরি গেলার-এর গুণমুগ্ধদের মধ্যে বহু কৃতী ব্যক্তি, এমন কি কিছু বিজ্ঞানীও ছিলেন। গেলারের অলৌকিক ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজের গণিতের অধ্যাপক জন জে টেলার নিম্ন-কম্পাঙ্কের তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণের (low frequency electro-magnetic radiation) তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন এবং 1975 সালে Superminds নামে একটি জনপ্রিয় বই প্রকাশ করেন। এর ভিত্তিতে সাইকিক নিউজ (Psychic News) নামে একটি পত্রিকা তাকে 'বছরের সেরা বিজ্ঞানী'র মর্যাদা দেয়। পরে টেলার নিজেই স্বীকার করেন যে তাঁর তত্ত্বটি কার্যকরী নয় এবং যে কোন রকমের অলৌকিক ঘটনার অস্তিত্ব নিয়েই সংশয়ের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। পরবর্তীকালে জোসেফ হ্যানলন নামে একজন পদার্থবিজ্ঞানী ইউরি গেলারের চতুর ছলনাকে নিশ্চিতভাবে উন্মোচিত করেন।

অলৌকিক ক্ষমতার গোপন রহস্য

যুক্তরাষ্ট্রে বিখ্যাত হওয়ার আগে ইউরি গেলার ইস্রায়েলে এক মঞ্চের যাদুকর ছিলেন। তাঁর প্রতিটি অলৌকিক ক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে যে কোন নিপুণ যাদুকরের পক্ষে দেখানো সম্ভব। জেম্‌স্ র‍্যান্ডি নামে এক যাদুকর তার প্রত্যেকটি যে শুধু দেখিয়েছেন তাই নয়, কিভাবে তা দেখানো সম্ভব তাও ব্যাখ্যা করেছেন। গেলারের এক সময়ের ম্যানেজার Yasha Katz কিভাবে গেলারকে প্রতারণা করতে সাহায্য করতেন তা বর্ণনা করেছেন। সানফ্রান্‌সিস্‌কোয় এক টি. ভি. অনুষ্ঠানের আগে এক সময় গেলার টি. ভি. কর্মীদের অন্যমনস্ক করে রাখেন এবং সেই ফাঁকে Katz কৌশলে গোপন খামগুলো খুলে তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে গেলারকে

টি. ভি. অনুষ্ঠান শুরুর আগেই জানিয়ে রাখেন। তাঁরই বক্তব্য থেকে জানা যায় কিভাবে Shipi Shtrans নামে এক সহকারী দর্শকদের গাড়ীর লাইসেন্স নাম্বারগুলো লিখে রাখতে গেলারকে সাহায্য করতেন, পরে একে অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শন হিসাবে উপস্থাপন করা হোতো।

অলৌকিকতা বনাম বিজ্ঞানী

1880 সালে লণ্ডনে স্থাপিত Society for Psychical Research গত একশো বছরে অলৌকিক ক্ষমতার নামে বহু প্রতরণাকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। এই প্রতারকের তালিকায় থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাত্রী মাদাম ব্লাভাতস্কিও রয়েছেন। প্রেতমাধ্যম হিসাবে বোধহয় Eusapia Palladino-র খ্যাতিই সবচেয়ে বেশী ছিল। 1895 সালে কেম্ব্রিজে একুশটি অধিবেশনের পর Society তাঁর কৌশলকে ধরে ফেলে। তাঁর হাত দুটোকে অন্যেরা ধরে থাকা সত্ত্বেও গোপনে পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে সেই পা দিয়ে অদ্ভুতভাবে তিনফুট দূরের একটা টেবিলকে নাড়াতে পারতেন, যেটা মেঝেতে লুকিয়ে থাকা একজন লোক পরিকল্পনামতো হাতেনাতে ধরে ফেলে। বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর হ্যারি হুডিনি অলৌকিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বহু প্রতারকের প্রতারণা উদ্‌ঘাটিত করেন।

বিভ্রমের শিকার

বিভিন্ন সময়ে নানা দেশে দেখা গেছে যে শুধু সাধারণ মানুষ নন, যথেষ্ট বুদ্ধিমান শিক্ষিত ও কৃতী ব্যক্তিরাও এই ধরনের প্রতারণায় বিভ্রান্ত হন। তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকলেও অলৌকিকতার ক্ষেত্রে অনেক সময় তাঁদের বিশ্লেষণী মনোভাবকে বিসর্জন দিতে দেখা যায়।

স্ববিরোধী আচরণের কারণ কী

আচরণের এই স্ববিরোধের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন এখনকার সমাজবিজ্ঞানীরা। যে কারণগুলি তাঁরা পেয়েছেন তার মধ্যে একটি হোলো জনসংযোগ মাধ্যমগুলির ভূমিকা। অলৌকিকতা সম্বন্ধে নানা ধরনের ঘটনা যে ভঙ্গীতে পরিবেশন করা হয়, সেটাই সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য দায়ী। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ইত্যাদিতে বিভিন্ন সময়ে অলৌকিক বা মেকী বৈজ্ঞানিক (pseudo-scientific) বিষয়কে বিশ্লেষণহীন এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন ভঙ্গীতে পরিবেশনের শিকার হন সাধারণ মানুষ।

জনসংযোগ মাধ্যমের ভূমিকা

যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণায় দেখা গেছে লোকেদের মধ্যে বেশীর ভাগ অলৌকিক ধারণার উৎসই হোল জনসংযোগ মাধ্যম। ছাত্রদের প্রশ্ন করা হলে তারা কখনোই কোনো প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উৎসের উল্লেখ করেনি। তারা বৈজ্ঞানিক মাধ্যম হিসাবে 'রিডার্স ডাইজেস্ট'—এর মত পত্রিকা এবং 'স্টার ওয়ার্স' বা 'এক্সরসিস্ট'-এর মত চলচিত্রের উল্লেখ করেছে। বিভিন্ন তথ্যচিত্র ও চলচ্চিত্রে বিভ্রান্তিকর তথ্যের সমাবেশ দেখা যায়। টালীগঞ্জের 'বাবা তারকনাথ' চলচ্চিত্রের কথা আমাদের এ প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে। এর স্রষ্টারা বলে থাকেন, আমরা নিছক আনন্দদানের জন্য এগুলি তৈরী করি, তথ্য পরিবেশনের জন্য নয় এবং দর্শকেরা নিজেরাই এই পার্থক্যটুকু করে নিতে পারবে। কিন্তু গবেষণা করে দেখা গেছে কার্যক্ষেত্রে উল্টো ফলই ঘটছে। আমাদের দেশেও এক প্রথম সারির দৈনিক রেসকোর্সের কাছে 'আলিপুরে পুলিশ ভূত'-এর আজগুবি কাহিনীকে সংবাদ হিসাবে পরিবেশন করেছিলো কিছুদিন আগে, যার বিস্তারিত অনুসন্ধানের রিপোর্ট পরে 'উৎসমানুষ' নামে বিজ্ঞান মাসিকের মে 1982 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

মানসিক গঠন কি কিছুটা দায়ী ?

বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে এত অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত অলৌকিকতা কুসংস্কার ইত্যাদিতে বিশ্বাসের বিস্তার দেখে মনে হতে পারে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গঠনেই কিছু সহজাত অপূর্ণতা রয়েছে। মানুষের প্রত্যক্ষের (cognition) ব্যাপারে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে মানুষের চিন্তার যুক্তিসূত্র ও সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়ার মধ্যেই কিছু দুর্বলতা ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে।

চিন্তা-প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা

সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায়—যখন বিশেষ একগুচ্ছ তথ্য বা বিশেষ কোন ঘটনাপরম্পরার মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত সম্বন্ধকে আবিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন মানুষ এমন একটি সম্বন্ধের ছক উপস্থিত করে যা তাদের এতদিনের বদ্ধমূল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এমন কি এই বিশেষ তথ্য বা ঘটনাপরম্পরা যদি তাদের পূর্ব-নির্ধারিত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী ইঙ্গিত দেয় সেক্ষেত্রেও এই প্রবণতা কাজ করে। পূর্বনির্ধারিত ধারণার সমর্থনকারী যুক্তি বা তথ্যগুলিকেই ব্যবহার করা এবং বিপরীত যুক্তিগুলিকে উপেক্ষা করা বা লক্ষ্য না করা (overlook), একমুখী চিন্তা ও বিকল্প প্রকল্পকে (hypothesis) বিবেচনা করার অক্ষমতা সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবণতাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তোলে 'নির্বাচিত বিস্মরণ, (selective memory)।

সম্ভাব্যতার ধারণা

যখন কোন অপেক্ষাকৃত জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তখন মানুষের আচরণ দেখে মনে হয় সম্ভাব্যতা (probabiliy) বিষয়টি সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। তারা ইতিবাচক দৃষ্টান্ত ও নেতিবাচক দৃষ্টান্তের অনুপাতকে বিবেচনা করার পরিবর্তে শুধুমাত্র ইতিবাচক দৃষ্টান্তকেই বিবেচনা করে। আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের (cognition) সীমাবদ্ধতার জন্য আমরা দেখা স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তব ঘটনার কাকতালীয় মিল পেলে তা লক্ষ্য করে আভিভূত হই। কিন্তু এর

বিপরীতে অমিলের দৃষ্টান্তগুলি আমাদের নজর এড়িয়ে যায় অনায়াসে। এইভাবে আমরা অত্যন্ত প্রাকৃতিক (natural) অথচ বিরল ঘটনার বহুসংখ্যক সম্ভাবনাকে মেনে নিতে ব্যর্থ হই। এই বদ্ধমূল ধারণাগুলিকে পাল্টানোর জন্য বিপরীত দৃষ্টান্ত ও যুক্তিগুলি সাধারণতঃ আমাদের মানসিক প্রতিরোধ ভেঙে সহজে কার্যকরী হতে পারে না।

ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা ঃ এর কারণস্বরূপ ফ্রয়েডপন্থী মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন মানুষের আচরণ শুধুমাত্র যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয় না, অনেকটাই মানুষের অবচেতন স্তরের আবেগ অনুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিচারবুদ্ধি কার্যকরী হয় চেতন স্তরে। অবচেতন স্তর, যেখানে বহু যুগ ধরে পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত আবেগ সংস্কার ইত্যাদি সঞ্চিত, তাকে ঐভাবে সরাসরি ও দ্রুত পরিবর্তন করা যায় না।

প্যাভলভীয় ব্যাখ্যা ঃ প্যাভলভপন্থী মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে সামাজিক পরিস্থিতি,প্রচলিত চিন্তাধারা, সংস্কার, জনসংযোগ মাধ্যমগুলির প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের এক ধরনের অভ্যাসে conditioning করা হয়। ফলে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট একটি প্রবণতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে, যাকে বলা হয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া (reflex action)। এর প্রভাবকে কাটিয়ে ওঠার জন্য de-conditioning অর্থাৎ বিপরীতধর্মী প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় অভ্যস্ত করা দরকার।

কিন্তু জনসংযোগ মাধ্যমগুলির অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানীদের ভূমিকা অত্যন্ত কম এবং বিজ্ঞানীরাও এ ব্যাপারে তত সচেষ্ট নন। ফলে অবৈজ্ঞানিক ধারণার বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচার তেমন গড়ে উঠছেনা।

তাছাড়া তীব্র আঘাতের মুখে, যেমন প্রিয়জনবিয়োগে আকস্মিকভাবে মানুষ নিজের আবেগের ওপর সাময়িক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং ফলে সহজে প্রেতব্যবসায়ী বা ঐ জাতীয় প্রতারকের শিকার হয়।

কুসংস্কারের পূর্বশর্ত ঃ পরীক্ষায় দেখা গেছে দু'টি শর্ত পূরণ হলে কুসংস্কার গড়ে উঠতে পারে। (এক), পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা (দুই), কুসংস্কার অবলম্বনের জন্য মূল্য দিতে হচ্ছে কম।

এইভাবে ভ্রান্তবিশ্বাস অনিশ্চিত নিয়ন্ত্রণহীন পরিস্থিতিতে মানুষের অসহায়তাবোধ ও উদ্বেগকে প্রশমিত করতে কিছুটা সাহায্য করে। এক নৃতত্ত্ববিদ একটি দ্বীপে লক্ষ্য করেছেন যে দ্বীপবাসীরা জলাশয়ে (lagoon) মাছ শিকার করার সময় তাদের মধ্যে কুসংস্কারের লক্ষণ দেখা যায় না, কারণ সেখানকার পরিবেশে তারা অভ্যস্ত এবং সেখানে শিকার পাবার পরিমাণও মোটামুটি নিশ্চিত। কিন্তু যখন তারা খোলা সমুদ্রের অনিশ্চিত পরিবেশে মাছ ধরতে যায়, তখন তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়তে দেখা যায়।

অনিশ্চয়তার মধ্যেও যেসব ক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ তেমন ক্ষেত্রে সচেতনভাবে আমরা মোহমুক্ত বিচারবুদ্ধি দিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করি। যেসব ক্ষেত্রে ভ্রান্তবিশ্বাসের ফলে ক্ষতির আশংকা কম, সেসব ক্ষেত্রে কুসংস্কারই জয়ী হয়।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঃ এইভাবে আমরা একই সময়ে 'অভিজ্ঞতা ও বিচারধর্মী' কর্মপন্থা এবং 'বিশ্বাস ও সংস্কারধর্মী' কর্মপন্থাকে দুই ভিন্ন কক্ষে রেখে বিনা দ্বিধায় পরিস্থিতি বিশেষে তাদের দুটিকে ব্যবহার করতে থাকি। ফলে বিশেষ এক ব্যক্তিকে জীবনসংগী হিসাবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আমরা কোষ্ঠী এবং জ্যোতিষের সাহায্য নিতে দেখি অথচ সেই একই ব্যক্তিকে ব্যবসার অংশীদার করার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং আইনগত দিকগুলোই খুঁটিয়ে বিচার করতে দেখি।

ভ্রান্তবিশ্বাসের মূল্য ঃ সাধারণতঃ যেক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করে ফললাভ করা যায় এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস গ্রহণ করাটা সুবিধের হয় না সেক্ষেত্রে আমরা সংস্কার বা একদেশদর্শীতার শিকার হইনা। আবার যদি দেখি কোন ভ্রান্তবিশ্বাস-কে বজায় রাখতে যে মূল্য দিতে হচ্ছে তার তুলনায় আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সেটি বজায় রাখার প্রয়োজনটা অনেক বেশী, তাহলে সেই বিশ্বাসটা কত অযৌক্তিক সে বিচার অনেক সময় ততটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তখন নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্য 'বিজ্ঞান সর্বত্র প্রযোজ্য নয়' বা 'বিজ্ঞানীরা সর্বজ্ঞ নয়, তাদেরও ভুল হয়' এই জাতীয় কোন যুক্তিতে আত্মপক্ষ সমর্থনের পথ খুঁজি।

ক্লাসরুমের বিজ্ঞানশিক্ষা ঃ এছাড়া স্কুল কলেজে আমাদের চারপাশের পরিবেশকে গভীরভাবে বোঝবার অস্ত্র হিসাবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে কদাচিৎ শেখানো হয়। ছাত্ররা তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে ব্যবহার শিখতে পারেনা বরং তারা কিছু আপাত—অভিজ্ঞতাবিরোধী তথ্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়—যেমন পৃথিবীর আকার গোল, পৃথিবী ঘুরছে, পদার্থ পরমাণু দিয়ে গড়া, ইত্যাদি। তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা বিষয়ে তারা কিভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করবে তা ক্লাসে কদাচিৎ শেখানো হয়। ফলে তারা ক্লাসরুমের সীমিত পরিধিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং তার বাইরের বৃহত্তর জগতে তাদের উপলব্ধির ওপর নির্ভর করতে শেখে।

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন সময়ে কিছু কৃতী বিজ্ঞানীদের অবৈজ্ঞানিক আচরণ করতে, প্রতারণায় বিভ্রান্ত হতে দেখা যায়। ফলে তাদের দৃষ্টান্তে অন্যেরাও কোনটা বিজ্ঞানের সঠিক আদর্শ ধরতে না পেরে বিভ্রান্ত হয়।

তৃতীয়তঃ বহু অলৌকিক দাবীকেই সামান্য কিছু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে নস্যাৎ করা যায়, কিন্তু সেটুকু জ্ঞানও অনেকের থাকে না। যেমন ভারী ও হাল্কা বস্তু একই উচ্চতা থেকে মাটিতে এসে পড়তে একই সময় নেয় কিনা—এ ব্যাপারে দেখা গেছে অনেকেরই সঠিক ধারণা নেই।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অসাধারণ অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত বহু প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে গেছে। এই সীমাবদ্ধতার সুযোগ নিয়ে অলৌকিকতায় বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেওয়া হোলো মানবসভ্যতার অগ্রগতির বিপক্ষে কাজ করা; এটা শুধু বিজ্ঞান নয়, এমন কি সাধারণ কান্ডজ্ঞানেরও আদর্শবিরোধী।

উৎস ঃ
(1) Occult beliefs
—Barry Singer & Victor A. Benassi, Science Today, May 1981.
(2) Parapsychology : fact, fiction or fraud ?
—Suresh Kanekar, Scicnce Today, October 1983.

শীতলা বসন্তের দেবী। বসন্ত রোগের আবির্ভাব আর প্রকোপ বৃদ্ধির পাশাপাশি ঘটেছে দেবী রূপে শীতলার বিবর্তন, বেড়েছে শীতলার মাহাত্ম্য। কিন্তু একটা পর্যায়ের পর জনমানসে শীতলার প্রভাব আর বসন্ত রোগ থাকা না থাকার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে নি।

বসন্তরোগ ও শীতলা

কুমারেশ মিত্র

প্রায় এক যুগ হয়ে গেল ওয়ার্ল্ড্ হেল্থ্ অরগানাইজেশনের (WHO) সতর্ক প্রত্যয়—বিভীষিকাময় মৃত্যুফাঁদ, ভয়ংকরী বসন্ত রোগ পৃথিবী থেকে মুছে গেছে। তবু আজও দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার 24-পরগণা, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শীতলা পূজিত হয় সাড়ম্বরে সারা বছর ধরে, ফাল্গুনের দোল পূর্ণিমায় বা বৈশাখের শনি-মঙ্গলবারের বাৎসরিক উৎসবে। এ উপলক্ষ্যে সপ্তাহ-পক্ষকালব্যাপী গ্রামীণ মেলায় দূর-দূরান্তের মানুষ আজও ছুটে আসে দেবীর কৃপা ভিক্ষায়। কালে কালে শীতলা পরিণত হয়েছে মড়ক ও মহামারীর দেবীতে, দারিদ্র্য-দূরকারিণী, সর্বরোগহারিণী জীবন্ত বিগ্রহে![1] হাম, জল-বসন্ত, বসন্ত রোগ ও যে কোন ধরনের স্বল্প-মেয়াদী মহামারী চর্ম-বিস্ফোটনও শীতলারই সৃষ্টি—মানুষের এ বিশ্বাস আজও গভীর। গ্রামময় পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ মানুষই যদিও একাধিকবার বসন্ত রোগের টীকা বা vaccine নিয়েছে, এই এলাকা প্রায় এক যুগ ধরেই বসন্ত-মুক্ত, তবুও মানুষের বিশ্বাস, এ রোগ সংক্রামক—আক্রান্ত শরীর থেকে এক দৈব বীজ অন্য অনাক্রান্ত শরীরে সংক্রামিত হয়। টীকা প্রয়োগের ফলাফল শীতলা পূজার উপর কোন রকম প্রভাব ফেলেছে বলে মনেই হয় না। বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশে শীতলার উত্থান বসন্তরোগের বিকাশ ও প্রাদুর্ভাবের ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এই ইতিহাসটুকু একটু পর্যালোচনা করা যাক।

বসন্ত রোগ শুরুর ইতিহাস

প্রায় দু হাজার বছর ধরে ভারতীয় মেডিক্যাল সাহিত্য সংকলনে মসূরিকা নামে একটি রোগ চিহ্নিত হয়েছে। রোগসৃষ্ট বিস্ফোটকের রঙ, আকার ও দৃঢ়তার সাথে মসুর শস্যের সাদৃশ্য থাকার দরুণই সম্ভবতঃ এ ধরনের নামকরণ। মসূরিকার উল্লেখ অথর্ব থেকে না মিললেও একটি মতানুসারে এই গ্রন্থ চালু হওয়ার সময়েই ভারতবর্ষে এই রোগের কিছুটা প্রকোপ ছিল। অথচ চরক ও সুশ্রুতয় রোগটির উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রন্থদুটি খৃষ্টীয় সময়ের আগেই রচিত হয়ে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যেই পূর্ণতা পায়। এগুলিতে বর্ণিত রোগের বিবরণ পরবর্তীকালের মেডিক্যাল সংকলনে পুনরুল্লেখিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগের বিপজ্জনকতা সম্পর্কে কোন রকম ইংগিতই ছিল না। রেকর্ড থেকে দেখা যায়, মসূরিকা রোগই খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে ও ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে। স্মরণাতীত কাল থেকেই এ দেশে এ রোগের বিস্তার ঘটে। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে মনে করা যেতে পারে উষ্ণ ও আর্দ্র, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পরিবেশ বা অন্য কোনো অজ্ঞাত কারণের প্রভাবে মসূরিকা রোগের ক্রমান্বয়ে বিবর্তনে আধুনিক বিভীষিকাময় বসন্ত রোগের উদ্ভব ঘটেছে।

সপ্তম শতকে বাণিজ্যিক লেনদেনের সূত্র ধরে বসন্তরোগ (সম্ভবতঃ হামও) মিশর ও আরব দেশে ছড়িয়ে পড়ে, নীলনদের বদ্বীপ এলাকায় বেশ কিছুকাল ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। আরব দেশের লঘু জনবসতির দরুণই রোগ-সংক্রমণ-চক্র শেষ অবধি ভেঙ্গে পড়ে। কেননা, বসন্ত রোগের বীজ মানুষের শরীরের বাইরে মাত্র একবছর নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে; সংক্রমণ শৃংখল অটুট থাকতে হলে সব সময়েই রোগীর দেহ থেকে রোগের বীজ অনাক্রান্ত মানুষের শরীরে সংক্রামিত হতে হবে। তাই চীন ও ভারতবর্ষের মত ঘন বসতিপূর্ণ দেশই ছিল এ রোগের স্থায়ী বাসভূমি। খৃষ্টপূর্ব সময়কালীন সভ্যতায় দূর ভ্রমণের স্বল্পতা ও শ্লথগতি এই রোগকে মূলতঃ এশিয়ার সীমায় বেঁধে রেখেছিল। পরবর্তী কালে কোন এক সময়ে আফ্রিকায় বাসা বাঁধে। ইউরোপে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীতে।

দেব-মন্ডলে শীতলার আর্বিভাব

জেম্স্ ফ্রেজারের মতানুযায়ী আদিম সমাজব্যবস্থায় মানুষ প্রকৃতি সাপেক্ষ তার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুণই বিশ্বাস করত, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা বিরাজমান। এই সময়ে কল্পিত দেবতা, মানুষরূপী দেবতা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য ছিল না বললেই হয় এবং থাকলেও তা খুবই অস্পষ্ট, অলৌকিক ক্ষমতার সামান্য হেরফেরে সৃষ্ট। এটা ছিল জাদুবিদ্যার যুগ। মানুষ ঝড়-বৃষ্টি

দ্বাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত ভারতীয় চিকিৎসক মাধব জীববিজ্ঞান অনুসরণ করেই হাম, জলবসন্ত ও বসন্তরোগের চিকিৎসাধারার প্রবর্তন করেন, রক্ত, কফ ও পিত্ত নির্ভর তত্ত্বের ভিত্তিতে।

খরা-বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারী, রোগ-ব্যাধির মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেতে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টায় নানারকম জাদুক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করত। এর পর দীর্ঘ ঐতিহাসিক পর্যায় জুড়ে মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃতির বিশালতার তুলনায় নিজের অসহায়, দুর্বল অবস্থা ও ক্ষমতার

সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে শেখে। দেবমানুষ (যারা আসলে জাদুকর হিসাবে সমাজের বিপদ উত্তরণে নানা রকম জাদু ও মায়া-আশ্রয়ী কাজ-কর্ম সম্পাদন করত) ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে পার্থক্য বাড়তে থাকে। দেবমানুষেরা, প্রভুত্বকারী শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়; সমাজে শ্রেণী-বিভাজন ও শ্রম-বিভাগের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। প্রাক্ সাম্যবাদী আদিম সমাজে জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে মানুষ ক্রমান্বয়ে নিজের অলৌকিক শক্তিতে আস্থা হারাতে শুরু করে এবং স্বর্গীয় দেবতাদের অতিমানবিক অলৌকিক শক্তির মূল উৎস হিসাবে ভাবতে শেখে।[৪] সেই থেকেই দেবসৃষ্টির দু'ধরনের প্রক্রিয়া আবহমানকাল ধরেই চলে এসেছে। তাই একদিকে যেমন প্রকৃতির অবগুন্ঠনের আড়ালে অদৃশ্য জাদুকর অলৌকিক শক্তিধর দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনি বসন্ত

ভারতবর্ষে ষোড়শ শতকের মধ্যেই বসন্ত রোগের কারণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে দুটি পূর্ণ তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছিল, এর প্রথমটির ভিত্তি ছিল জীববিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ-নির্দেশিত পথ্য-বিধান ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা পদ্ধতি। অপর তত্ত্বটি রোগ সৃষ্টির স্বর্গীয় যন্ত্রণার মতবাদের উপর গড়ে উঠেছিল এবং রোগ উপশমের চিকিৎসায় শীতলা পূজার অপরিহার্যতা নির্দেশিত ছিল।

রায়, দক্ষিণ রায়, বড় খাঁ গাজী, কালু রায়ের মত প্রবল প্রতিপত্তিশালী সামন্ত-রাজা, ভূস্বামী বা ধর্ম-সমাজ-রক্ষক শ্রেণীসমাজে সামাজিক মর্যাদার জোরেই নিয়মিত পূজার দেবতায় পরিণত হয়েছে। দেবসৃষ্টির এই দ্বিতীয় ধারাটি অবশ্য অপেক্ষাকৃত অনেক দুর্বল, অনেক সময়েই মানুষরূপী দেবতারা আসল দেবতাদের আশ্রয়পুষ্ট হয়ে একই সঙ্গে পূজা পায়। শীতলা পূজার সঙ্গে বসন্ত রায়ের পূজা এই ভাবেই গ্রাম-বাংলায় প্রচলিত হয়েছিল।[৪]

ধর্মীয় সংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতের প্রাচীন মানুষ মনে করত প্রতিহিংসা পরায়ণ দেবদেবীর খামখেয়ালিপনায় বা কৃত পাপের শাস্তি স্বরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছায় নানা ধরনের রোগভোগের সৃষ্টি হয়। দেবদেবী ছাড়া চতুর্দিকে বিরাজমান নানান অদৃশ্য দুরাত্মার আক্রমণ ও মানুষের শরীর অধিগ্রহণ অনেক রোগ-ব্যাধির কারণ। ঋক্‌বেদে (1500-900 খৃষ্ট পূর্বাব্দ) দেবদেবী বা মূর্তিপূজার অবশ্য কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। দেবদেবীর বিগ্রহপূজা শুরু হয় সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পরে। প্রাক্-সাম্যবাদী আদিম সমাজেই মানুষ জাদুবিদ্যা ছেড়ে দেবতার পূজা, স্তুতি, উৎসর্গ-উৎসবের মত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করে। তাদের বিশ্বাস এই সব পূজা-অর্চনার জাদু-ক্রিয়ায় দেবতার সন্তোষ বিধান করে বা দুরাত্মাকে শরীর থেকে নিষ্ক্রমণে বাধ্য করে রোগমুক্তি সম্ভব।[৫] এইভাবে মানুষের কল্পলোকে জন্ম হয়েছে বিপদত্রাতা অনেক দেবদেবীর। যেমন, মহামারীর দেবী রক্ষাকালী, সর্পদংশনের দেবী মনসা, ওলাওঠা রোগের দেবী ওলাবিবি এবং বসন্ত-হামের দেবী শীতলা।

অথর্ববেদে গুটিকা-ঠাকুরাণী (!) নামে এক অপ্রধান দেবীর উল্লেখ আছে। ইনি গুটিকা অর্থাৎ বসন্ত-মসুরিকা রোগের বিস্ফোটক উপশমের দেবী হলেও হতে পারেন। অথচ এর পরবর্তী সময়ে পঞ্চদশ শতক অবধি লিখিত মেডিক্যাল বইয়ে বসন্ত রোগের কোন দেবদেবীর খোঁজ পাওয়া যায় না। রোগের এক অপ্রধান দেবীর অস্তিত্বের কথা জনা যায় অন্য সূত্র থেকে। দেবীর এমন কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, যা পরবর্তী-কালের পরিচিত নারীমূর্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। দ্বাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত ভারতীয় চিকিৎসক মাধব জীববিজ্ঞান অনুসরণ করেই হাম, জলবসন্ত ও বসন্তরোগের চিকিৎসা ধারার প্রবর্তন করেন, রক্ত কফ ও পিত্ত নির্ভর তত্ত্বের ভিত্তিতে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাঁর গ্রন্থের টীকাকাররা তাঁরই প্রবর্তিত চিকিৎসাধারা অনুসরণ করে যান, রোগ সম্পর্কে দেব ও অসুরের কোন সম্পর্ক না তুলেই। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে একজন অজ্ঞাতনামা টীকাকারই গ্রন্থটির শেষে 'শীতলার রোগবিদ্যা' নামে একটি পরিশিষ্ট জুড়ে দিয়ে রোগটির দেব সৃষ্টির তত্ত্বের প্রথম উল্লেখ করেন। একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতেই বসন্তরোগ আরও ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে মনে করা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর সুশ্রুতর সংকলনেই রোগসৃষ্টির দেবতত্ত্বের একটি ইঙ্গিত ছিল। এই গ্রন্থে মসুরিকার জনপ্রিয় নামকরণ হয় শীতলিকা। কারণ তদানীন্তন ভারতবর্ষে রোগটির চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল অসুখের সমগ্র কাল জুড়েই রোগীর শীতলতা বিধান করা, তাই হয়ত এই নামকরণ।

ভারতবর্ষে ষোড়শ শতকের মধ্যেই বসন্ত রোগের কারণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে দুটি পূর্ণ তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছিল, এর প্রথমটির ভিত্তি ছিল জীব বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ-নির্দেশিত পথ্য-বিধান ও আনুসঙ্গিক চিকিৎসা পদ্ধতি। অপর তত্ত্বটি রোগ সৃষ্টির স্বর্গীয় যন্ত্রণার মতবাদের উপর গড়ে উঠেছিল এবং রোগ উপশমের চিকিৎসায় শীতলা পূজার অপরিহার্যতা নির্দেশিত ছিল। এই ষোড়শ শতাব্দীতেই মেডিক্যাল গ্রন্থে বসন্তের দেবী শীতলার প্রথম আবির্ভাব ঘটে। ভবমিশ্র তাঁর সংস্কৃত মেডিক্যাল গ্রন্থ ভবপ্রকাশে মাধবকে অনুসরণ করেই হাম-বসন্তের জীব-বিজ্ঞান নির্ভর, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেন এবং সঙ্গে শীতলার রোগবিদ্যা নামে একটি পরিচ্ছেদও যোগ করে দেন।

প্রাচীন ভারতে পরিব্রাজকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, বসন্ত রোগে আক্রান্ত মানুষের শরীরে বিস্ফোরনশীল বিস্ফোটক, পূতিগন্ধময় ক্ষীয়মান মাংস, ভীতিপ্রদ মুখের চেহারা মানুষের শরীরে চেনার অতীত বিকৃতি ঘটায়, মানুষকে অন্ধ করে দেয়, সাক্ষাৎ মৃত্যু এসে গ্রাস করে। এই বিভীষিকাময় পরিবেশ-জাত ত্রাস, উদ্বেগ এবং সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের অজ্ঞতা মিলে বসন্ত রোগের দেবী শীতলার জন্মের একটি বাতাবরণ তৈরী করে দেয়—দেবমন্ডলে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক

কারণেই এক নতুন দেবীর সংযোজন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সম্ভবতঃ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বা তার কিছুকাল আগেই বর্তমানের পরিচিত নারীমূর্তির দেবী শীতলা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গুজরাট থেকে বাংলাদেশ অবধি সহস্রাধিক মাইল বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আবিষ্কৃত এই সময়ের দেবীমূর্তিগুলিতে আশ্চর্য রকমের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায় যা স্কন্দপুরাণে দেবীর বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। শীতলা বাহন গর্দভে আসীনা, দুই হস্তে ধারণ করেন পূর্ণ কুম্ভ ও সম্মার্জনী, মস্তকে থাকে কুলা। প্রতিমার কল্পনায় মানুষের মনে লালিত আদিম জাদুবিশ্বাস কাজ করেছে বলেই মনে হয়।[2] সম্মার্জনীর সাহায্যে জঞ্জাল সাফ করার জাদুক্রিয়ায় রোগীর শরীর থেকে রোগ-তাপ ও বিস্ফোটকের যন্ত্রণা দূর হয়ে যায় বলে কল্পনা করা হয়। কুম্ভের অমৃতময় জল ছিটিয়ে দেবী রোগ-তাপ প্রশমিত করে রোগীর শান্তি বিধান করেন। কুলার বাতাস অবাঞ্ছিত অমঙ্গল দূরীকরণে সদৃশবিধানের যাদু-কর্ম। শীতলা বসন্তরোগ ছাড়াও অন্য সমস্ত রোগ উপশম, দুঃখ-দুর্দশা মোচন ও পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের দেবী হিসাবেও স্বীকৃতা। তাই কোন আবরণী-ই এই মহান দেবীকে আবৃত রাখতে পারে না। তিনি নিরাবরণা।

দেবদেবীর ক্রম-বিবর্তনে শীতলা

যদিও আজও বাংলায় হিন্দুগ্রামে শীতলা, চন্ডী ও মনসা গ্রামদেবতা রূপে পূজিত হয়, শীতলা কিন্তু আঞ্চলিক দেবী নয়। নেপাল ও সমগ্র হিন্দু আর্যভাষী অঞ্চলে দেবীকে একটি নামেই ডাকা হয়। কেবল মাত্র দাক্ষিণাত্যে শীতলা কয়েকটি অন্য নামে, যেমন, মরিয়ম্মা, সরম্মা, হেথনা, শীতলাম্মা, সুখজম্মা ইত্যাদি নামে পরিচিতা। বাহন গর্দভ, কুলা, সম্মার্জনী বাদ দিলে শীতলার সঙ্গে সরস্বতী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, দুর্গা, ষষ্ঠী প্রভৃতির সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট।[5] এইসব দেবসত্তার আংশিক সংমিশ্রণে পৌরাণিক যুগের শেষ দিকে শীতলার আবির্ভাব ঘটে। শীতলার উপর ষষ্ঠীর বিশেষ প্রভাব রয়েছে। রাঢ়ের গ্রামঞ্চলে এরা এখনও শক্তির অভিন্ন প্রতীক রূপে চিহ্নিত হয়। তাই ষষ্ঠীর অপর নাম শীতলা। শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন শীতলা ষষ্ঠী নামেই পরিচিত—শীতল অর্থাৎ বাসি নৈবেদ্য দিয়েই শীতলা ষষ্ঠী পূজা করার রীতি। লক্ষ্মী ও ষষ্ঠীর মত শীতলা সরস্বতীর অংশরূপেও আবির্ভূতা। আবার নিম্ন বাংলার লৌকিক সংস্কৃতিতে শীতলা মনসার সহচরী, সাবিত্রী কন্যা; শীতলা যমের ভগিনী, শংকর গৃহিনী, সদাশিবা অর্থাৎ চন্ডী ও দুর্গার প্রকার ভেদ।[6] অনেকে আবার মনে করেন বৌদ্ধদেবী পর্ণশবরী বাংলাদেশে নাম পাল্টিয়ে শীতলায় পরিণত হয়েছে। পূর্ব বাংলায় আবিষ্কৃত দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর পর্ণশবরীর মূর্ত্তিতে দেখা যায়, দেবীর পদতলে বসন্ত রোগাক্রান্ত কয়েকটি লোক শায়িত, সঙ্গে একটি গাধার মূর্ত্তি—যা পরিষ্কার ভাবেই শীতলাকে নির্দেশ করে।[7] তাই এইসব দেবদেবীর বিবর্তন ও শীতলার উত্থানের ইতিহাস খুবই জটিল; তা ভবিষ্যৎ গবেষকের ভাবনার বিষয় হতে পারে। অনেকে বৌদ্ধ দেবী হারিতি-ই শীতলায় পরিণত হয়েছে বলে মনে করলেও, হারিতী যে শীতলা ও ষষ্ঠীর প্রভাবে পরিকল্পিতা এরকম সিদ্ধান্ত টানারও যথেষ্ট ভিত্তি রয়ে গিয়েছে।

বসন্তের টিকা

ষোড়শ শতকে ভবমিশ্রের লেখায় বা পূর্ববর্তী কোন মেডিক্যাল গ্রন্থে বসন্ত রোগের টিকাদান পদ্ধতির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইউরোপের কৃষকেরা সপ্তদশ শতাব্দীতেই টীকাদানের যে পদ্ধতি অনুশীলন করত, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডাক্তাররা সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করে। বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে স্থানীয় চাষী, মুচি ও মালাকারদের এই টিকাদান পদ্ধতি অনুশীলন করতে দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে বসন্ত রোগীর শরীর থেকে সামান্য পুঁজ নিয়ে বা বিস্ফোটকের শক্ত কণা গুঁড়ো করে সংগ্রহ করা হত রোগ-জীবাণু। এই পুঁজ বা কণা তীক্ষ্ম সূচ বা নরুনের সাহায্যে হাতের (কখন কখনও বা কপালের) চামড়া ফুটো করে সাধারণতঃ তিন থেকে দশ বছর বয়সী মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। এই ভাবে টিকাগ্রস্ত মানুষ বসন্ত রোগের আক্রমণের প্রতিরোধক্ষমতা অর্জন করত।

আরেকটি বিবরণ থেকে জানা যায় বৃন্দাবন, এলাহাবাদ, বেনারসের বিভিন্ন কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে এক বিশেষ জাতের ব্রাহ্মণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দূরবর্তী প্রদেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ত বসন্ত প্রতিষেধক টিকাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে। বাংলাদেশে সাধারণতঃ এরা ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে পেঁছত। কেননা ষোড়শ শতকেই, হিন্দু ধর্মীয় বছরে বাঙালী হিন্দু স্মার্ত দেবীর স্নান নির্দেশ করেছিলেন, শীতলাষ্টমী ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টম চান্দ্র দিনে—শীতলাষ্টমী ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি থেকে মার্চ মাসের শেষ অবধি বসন্তকালের যে কোন দিনই হতে পারে। জনমানসে বসন্তরোগের পূর্বসূরী এই কৃষ্ণপক্ষ মৃত্যু ও অপবিত্রতার

"(অষ্টাদশ শতাব্দীর) মহামারীর বছরগুলোতেই বাংলা সাহিত্যে শীতলাকে নিয়ে রচনাগুলো লেখা হয়ে ছিল"।

প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত। এই বিবরণী থেকেই ধারণা করা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বসন্তরোগ বাংলাদেশের তুলনায় উত্তর ভারতেই অনেক বেশী পরিচিত ও বিস্তৃত ছিল। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে টিকা গ্রহণ ও অনুশীলন প্রক্রিয়ায় উত্তর ভারতের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগের সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই, বিশেষতঃ এর দ্বিতীয় অর্দ্ধে, বাংলাদেশে টিকাদান পদ্ধতির ব্যাপক অনুশীলন থেকে এই সময়ের এ অঞ্চলে বসন্ত রোগের ব্যাপক মহামারীর আকারের ধারণা করা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা, বসন্তরোগ ও শীতলা

ষোড়শ শতাব্দী থেকেই সংস্কৃত গ্রন্থে বসন্ত ও শীতলা সম্পর্কীয় রচনা শুরু হলেও সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এ বিষয়ে একটি কথাও খুঁজে না পাওয়া খুবই বিস্ময়কর। যদিও এই সময় সংস্কৃত রচনায় নিয়োজিত বিখ্যাত বাঙালী লেখকদের কাছে শীতলার পরিচিতি ছিল রীতিমতন।এই শতাব্দতেই অধিকাংশ বড় দেবদেবী সম্পর্কীয় রচনা মূল সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বাংলায় অনুবাদ হয়ে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বাংলা সাহিত্যে শীতলাকে নিয়ে অসংখ্য রচনা লেখা হয়। তাই মনে করা যেতে পারে বাংলার গ্রামের দেবমন্ডলীতে শীতলার অনুপ্রবেশ ঘটেছে অনেক পরে—সম্ভবতঃ ভারতের অন্য অঞ্চল থেকে। তা এই অঞ্চলে বসন্তরোগের ব্যাপ্তির ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

কলকাতা শহরের পত্তন ঘটে যে বছর সেই 1690 সালে বাংলা সাহিত্যে শীতলাকে নিয়ে প্রথম কবিতা রচিত হয় শহর থেকে দূর উত্তরে সপ্তগ্রামে। তাই একেবারে নিছক অনুমানের ভিত্তিতেই বলা যেতে পারে, 1690 সালের কয়েক বছর আগেই নিম্ন বাংলায় জনগণের এক সুনির্দিষ্ট ব্যাপক অংশ বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। রোগটি প্রথম মহামারী আকার ধারণ করে। দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলে রোগটির একটি স্থায়ী বাসভূমি গড়ে উঠেছিল। এই সময়েই রোগের দেবী শীতলার সৃষ্টি হয়; শীতলা ও বসন্ত রোগ সংস্কৃত মেডিক্যাল গ্রন্থে একটি স্থায়ী আসন দখল করে নেয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অবস্থা ছিল ভীষণ গোলমেলে। মোগল সাম্রাজ্য ছিল পতনোন্মুখ, ব্রিটিশের ক্ষমতা দখলের জমি তৈরী হচ্ছিল। 1742 সাল থেকে 1751 সালের মধ্যে মারাঠা দস্যুরা দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে সন্ত্রাস ও লুন্ঠন চালায়; এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সরে যেতে বাধ্য হয়। অনেক কর্ষণযোগ্য জমি পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে, শস্য ফলন ভীষণভাবে হ্রাস পায়, খাদ্যাভাব দেখা দেয়, টিকাদানের বার্ষিক ব্যবস্থা এবং ইতিমধ্যে টিকাগ্রস্থ শিশুদের রোগ-নিরোধী প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক আটক অবস্থা ভেঙে পড়ে। বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এই অবস্থায় 1744 সাল থেকে প্রতি সাত বছর অন্তর পর্যায়ক্রমে (1744, 1751, 1758, 1765 সালে) বসন্ত মহামারী আকার ধারণ করে। এর অন্তর্বর্তী সময়ে অবশ্য রোগটি ও এর সংক্রমণ চক্র এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে ভয়ের কিছু ছিল না বললেই হয়। এই মহামারীর বছর গুলোতেই বাংলা সাহিত্যে শীতলাকে নিয়ে মূল রচনা-গুলো লেখা হয়েছিল।

1757 সালে ব্রিটিশরা পলাশীর যুদ্ধে ক্ষমতা দখলের পর পশ্চিম বাংলার বর্ধমান ও মেদিনীপুরের এবং পূর্বে চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণ পায়। ক্ষমতা পেয়ে ব্রিটিশরা খাজনার জন্যে জমিদারদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। জমিদাররা সমগ্র সংকটটাই প্রজাদের উপর চাপিয়ে দেয়। ফসলের উপর ব্রিটিশ মনোপলি 1769 সালের তীব্র খরা ও অসফল চাষ, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন অর্থনৈতিক শোষণের জোয়ালে দরিদ্র মানুষের অস্বাভাবিক ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস, 1770 সালে বাংলা ও বিহারে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে মহামারী বসন্ত রোগ যুক্ত হয়ে এই বিভীষিকাময় দুর্ভিক্ষে প্রায় এক কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর নিম্ন বাংলার এই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা বসন্ত রোগকে সাধারণ রোগের পর্যায় থেকে তুলে নিয়ে জাতীয় বিপর্যয়ে পরিণত করে। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নিম্ন হুগলি নদীর ঠিক পশ্চিমে একটি সীমাবদ্ধ এলাকায়—যেখানে বসন্তরোগের মহামারী ও মারাঠা দস্যুদের লুন্ঠন সংঘটিত হয়েছিল—শীতলার স্তুতি ও বসন্তরোগের ভীতিকর যন্ত্রণার অসংখ্য বিবরণী বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়। এই সময়েই বসন্ত রোগের দেবী শীতলা তার অপ্রধান দেবতার আসন ছেড়ে নিম্ন বাংলার বড় দেবদেবীর পরিমন্ডলে নিজের আসন পাকাপোক্ত করে নেয়। বাংলার গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে পূজা পেতে থাকে দেবী শীতলা। গ্রাম বাংলার হিন্দু ও কোন কোন অঞ্চলের মুসল-মানেরাও বসন্ত রোগসৃষ্ট শীতলা পূজার উত্তরাধিকার এখনও সমানে বহন করে নিয়ে চলেছে।

* * * * * *

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বসন্ত রোগ নির্মূল হওয়ার আশ্বাস রেখেছে। কিন্তু শীতলার আসন টলে নি তাতে। কিসে টলবে সেটাই ভাববার বিষয়।

এই রচনার মূল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে The Journal of Asian Studies, Vol. XLI, no. 1, Nov. 1981 সংখ্যা থেকে। অন্যান্য সাহায্যকারী সূত্রের উল্লেখ নিচে দেওয়া হল ঃ

1. পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (2য় খণ্ড)—অশোক মিত্র
2. *The Golden bough—James Frazer*
3. বাংলার লৌকিক দেবদেবী—গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু
4. *The Healing Gods of Ancient Civilisation—Walter Addison Jayne*
5. ভারতের দেবদেবীর উদ্ভবের ইতিহাস—হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
6. রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর—ডঃ অমলেন্দু মিত্র
7. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড)—ডঃ অজিত বন্দোপাধ্যায়

শীতলা ও গণতন্ত্র

কলকাতার একটি প্রতিষ্ঠিত দৈনিক কাগজে 14. 4. 84 তারিখের সংস্করণে প্রকাশিত হাওড়া থেকে শ্রীঅলোক কুমার দত্তের লেখা চিঠির অংশ—

"নগর উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী প্রশান্ত কুমার সুর হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছেন। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ৪ই জুলাই, হাওড়া মিউনিমিন্যাল অ্যাক্ট 1980 অনুযায়ী। ঘোষণাটির পর থেকেই হাওড়া শহর চাঞ্চল্যে মুখর হয়ে উঠেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিকদের তরফে দ্রুত প্রস্তুতির কাজ চলছে। এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট শীতলাপুজোর প্যাণ্ডেলগুলির চাকচিক্য থেকে। গত বছরগুলির তুলনায় এবারে প্যাণ্ডেলগুলিকে আরো বেশী জাঁকজমক-পূর্ণ ও আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে। পুজোর উদ্যোক্তারা মনে হচ্ছে আগেকার সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে দরাজ হাতে খরচ করছে। বাম পার্টিগুলির নির্বাচনী প্রচারের ভূমিকা এ সব।....."

পত্রলেখক অবশ্য বাম পার্টিগুলির শীতলাপুজোকে মদত দেওয়ার ভিতর আলাদা করে অস্বস্তিকর কিছু দেখেন নি; তিনি অভিযোগ তুলেছেন, কংগ্রেস (আই) কেন একই ধরনের সংগঠিত সক্রিয়তা দেখাচ্ছে না? তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, মূল ব্যাপারটা হল 'গণতন্ত্র'। পশ্চিম বাংলায় গণতন্ত্র থাকবে কি না তারই নাকি কঠোর পরীক্ষা হবে আগামী নির্বাচন-গুলিতে।

স্বাস্থ্য অধিকর্তারা ক্ষুদে বসন্তকে নির্মূল করার আনন্দে ডগমগ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, কংগ্রেস (আই), বামফ্রন্ট, সবাইকে কলা দেখিয়ে হাওড়ার ও অন্য বহু জায়গার বস্তিগুলিতে পুজোর মণ্ডে বসে খলখল করে হাসছেন শীতলা দেবী। আর তাঁর সম্মুখে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য অবলীলায় একে অন্যের গলায় ক্ষুর চালিয়ে দিচ্ছে বস্তির জগা-পাঁচু-বিশুরা।

সন্ধানী

আমরা বিব্রত.....

মানি অর্ডারে গ্রাহক চাঁদা পাঠান কিন্তু কুপনে নাম ঠিকানা লেখেন না এমন অনেকেই আছেন। অনেক সময়ই যিনি টাকা রিসিভ করেন তিনি ফর্ম দেখে কুপনে নাম ঠিকানা টুকে নেন। কখনো-কখনো ভুল হয়ে যায় লিখতে। বিপদে পড়তে হয় তার উৎস সন্ধান করতে। তেমন কয়েক জনের টাকা এসে পড়ে রয়েছে। যাঁরা পাঠিয়েছেন পত্রিকা না পেয়ে স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা বিরক্ত। আমরাও বিব্রত। এমন যদি কেউ থাকেন কবে কত টাকা পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে আমাদের জানান।

সঃ মঃ/বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ELECDROLIK ENGINEERING COMPANY

Sri Aurobindo Road, Ramrajatala

Howrah-711104.

Phone : 67-2017

Gram : SPOOLVAL, Santragachi

MANUFACTURERS OF :

PORTABLE OIL HYDRAULIC EQUIPMENT, viz :

Hydraulic Floor Crane capacity 1-2 tonnes, Hand/Power operated Hydraulic Compressor jointing of ACRS conductor capacity 100 tonnes. Power operated 2 stage High Pressure Pump Unit upto 600 Kg/cm². Hand operated Pump Unit upto 800 Kg/cm². Lever operated spool type Directional Control Valve with in-built pilot operated Check Valve. Hand/Power operated Hydraulic Clamp/Vice capacity upto 10 tonnes.

তথাকথিত 'কু'সংস্কার এবং প্রচলিত কু-সংস্কার

অসীম চট্টোপাধ্যায়

অভিজাত বিজ্ঞান-এর ছত্রছায়ায় থেকে ব্যাপক মানুষের জীবনচর্চা থেকে বেরিয়ে আসা লোকবিজ্ঞানকে বোঝা যায় না। তারই নিদর্শন 'কু-সংস্কার' অভিধাটি।

শেকড়-বাকড় বা রত্নের ব্যবহারের উৎস জানতে গেলে যে নির্দিষ্ট সমাজ-প্রণালীর মধ্যে তার উদ্ভব—সেই প্রণালীকে বোঝার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

শেকড়ের উদ্ভব রত্নের চেয়ে আগে। প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে সেটাই সম্ভব। সে সময় মানুষ দলবদ্ধ ভাবে জীবন কাটাতো। 'টোটেম্' শব্দটা এসেছে আমেরিকার ওজিবওয়া আদিবাসীদের ভাষা থেকে। টোটেম প্রতীক, একটা বিশ্বাস। কখনও কোনো পশু বা পাখী অথবা গাছ টোটেম্ হয়েছে। বিশ্বাসটা এরকম—গোষ্ঠীর প্রত্যেকে ভাবে, আমিই বাজপাখী। অর্থাৎ—টোটেমের সঙ্গে ব্যক্তি একাত্ম, অভিন্ন। এটাকেই বলা যায় 'একাত্ম টোটেম্'। আদিম জাতিদের বিশ্বাস, তারা এই সব টোটেম্ থেকে উদ্ভূত এবং এই টোটেম্ তাদের বিশেষ যত্ন, শ্রদ্ধার অধিকারী। ভারতবর্ষের ইতিহাসে চোখে পড়ে অজস্র টোটেম্। আজও সাঁওতালরা করম গাছকে পুজো করে। অতীত ভারতবর্ষে বাবুল, পিপুল, মুলজারা, বুনো ডুমুর, কদম গাছ, পুজো পেতো। অনেক মুদ্রায় পাওয়া গেছে গাছের ছবি। বোঝা যায় গাছ বাঁচিয়ে রাখতো মানুষকে, তাই সে ছিল রহস্যময় শ্রদ্ধার বস্তু। অতএব, উপকারী বন্ধুটির একটা অংশ সারাক্ষণ দেহের সঙ্গে রেখে সৌভাগ্য অর্জনের প্রচেষ্টা সেই যুগের অসহায় মানুষদের কাছে একান্ত সাধারণ ঘটনা।

ধর্মচেতনার সাথে টোটেম্বাদের একটা পার্থক্য আছে। ধর্মচেতনার আগে টোটেম্ ছিলো প্রতিটি মানুষের সাথে একাত্ম। ভক্তি বস্তুবাদ (fetishism) ধর্ম বিশ্বাসের পথে একটা পদক্ষেপ কিন্তু এতে ম্যাজিকের প্রভাব অনেক বেশী কিন্তু টোটেম্বাদের সামাজিক দিকটাই অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসের যে মূল কথা অর্থাৎ উপাস্য-উপাসকের ফারাকটা ছিলোনা। এখানে প্রত্যেকেই নিজেকে ভাবছে বাজপাখী অথবা বাবুল গাছ। গোষ্ঠী (clan)-গুলোর নাম হোতো টোটেম্ অনুযায়ী। একটা উপজাতির মধ্যে দুটো ফ্রাত্রী, আবার প্রতিটা ফ্রাত্রীর 4/5টা করে গোষ্ঠী থাকত। আমাদের চালু কশ্যপ এসেছে কচ্ছপ থেকে, ভরদ্বাজ ভরত পাখী থেকে, শাণ্ডিল্য মানেও পাখী, শুনকের অর্থ কুকুর, ইত্যাদি। সমাজ বিকাশের এই অবস্থাটার পরই আকস্মিক ভাবে আমরা থমকে দাঁড়াই। মানুষ নতজানু হয়ে এই টোটেম্কে পুজো করছে। ধর্ম এসে গেছে, সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তিও। ক্রমশঃ টোটেম্ হয়েছে রাজশক্তির প্রতীক। সুতরাং, গাছ গাছড়ার প্রতি আনুগত্যের উৎসটা বোধ হয় আমরা কিছুটা খুঁজে পাচ্ছি এই টোটেমের আলোচনার মধ্যে থেকে।

আসলে, শেকড় প্রভৃতিতে চূড়ান্ত বিশ্বাসটা প্রয়োজনীয় ছিলো। প্রকৃতির অনুকরণ করে (নাচ-গান-ছবিতে) নিজেদের আকাংখাকে প্রকৃতির উপর চাপাতে চাইতো অসহায় মানুষ। আর তাই দেখা যায়, প্রাচীন সমাজে নারীর ভূমিকাও বিরাট। নারীর সন্তানবতী হওয়া আর প্রকৃতির ফলবতী হওয়া সমার্থক ছিলো। উদাহরণ অসংখ্য দেওয়া যায় সারা পৃথিবী থেকে। যেমন, জাভা দ্বীপের অনেক গ্রামে ধান পাকার সময় কৃষাণ-কৃষাণী রাত্রিবেলা ধানক্ষেতে যৌন মিলন করে। বিশ্বাস—ফসল বেশী হবে। ভারতবর্ষের অনেক জায়গার সাঁওতালরা ফসলের সময় অবাধ (কয়েকজনকে বাদ দিয়ে) যৌন মিলন করে। বিশ্বাসটা একই। একই ছবি মধ্য আমেরিকার পিপিলে আদিবাসী গোষ্ঠীতে। শেষ একটা কথা। এদেশে ষষ্ঠী সন্তান-দায়িনী দেবী। ষষ্ঠিক বা ষষ্টিকা মানে ব্রীহি (বা ষেটে) ধান। এই ধান ষাটদিনে পাকে, তাই নাম ষষ্ঠিক। দেবীর নাম আর ফসলের নামে আশ্চর্য মিল। তৎকালীন চিত্রকলা, লোককথা, লোক-পুজোয় এর ছাপ সুস্পষ্ট। (আজও এই বাংলার লোকপুজোয় সম্ভবতঃ দক্ষিণরায় আর ষেঁটু ছাড়া সকলেই নারী।) প্রকৃতিকে অনুকরণ করে এই ভাবে নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যায় না। এগুলোকেই বলা হয় Black Art বা Magic, কিন্তু যে প্রেরণা সে পেতো তা দিয়ে সে কাজ করতো দ্বিগুণ, ফলও পেতো সেই অনুপাতে। তাই এই অন্ধ বিশ্বাসটুকু তাদের দরকার ছিলো। শেকড় ধারণও একই বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি।

অবশ্য রত্ন প্রসঙ্গ কিছুটা জটিল। একটা অপ্রয়োজনীয় বস্তু কিভাবে সৌভাগ্যের প্রতীক হয়ে ওঠে? প্রথমত, প্রাচীন সমাজে অলঙ্কারের ভূমিকা ছিল বিরাট, প্রকৃতির মতো করে নিজেদের সজ্জিত করত মানুষ। খৃষ্টের জন্মের বহু আগে থেকেই এই রত্নের ব্যবস্থা চালু ছিলো।

একই সঙ্গে, সোনা হয়েছিলো বিনিময়ের মাধ্যম। ফল দাঁড়াল—যার সোনা আছে—সে সৌভাগ্যবান আর যে সৌভাগ্যবান—তার সোনা আছেই। এই অর্থনৈতিক ভূমিকা যখন ক্রমে জাদুবিশ্বাসের প্রান্তরে নামলো, তখন দেখা গেল মানুষ সোনা ধারণ শুরু করেছে।

গ্রহের জন্য ধারণীয় রত্নের পেছনেও একটা প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী চোখে পড়ে। রবি (Sun) আর সোম (Moon)-এর কথা ধরা যাক। রবির রত্ন মাণিক্য (Ruby)-এর রঙ ডালিমদানার মতো লাল। সোম-এর রত্ন মুক্তা (Pearl), রঙ মাখনের মতো সাদা, স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য। সূর্য আর চাঁদের রঙের সঙ্গে রত্নের রঙের মিলটা ভেবে দেখতে হয়। এছাড়া,

রবির ধাতু তামা, সোমের রুপো। রঙের মিলটা আবার প্রকট। তাছাড়াও—মাণিক্য, মুক্তা, তামা আর রুপোর ব্যবহার আছে আয়ুর্বেদে। সবটা মেলালে উৎসটা অনেক পরিষ্কার হয়ে আসে।

তাহলে কি ধর্মের এজেন্টরা কিছু চাপায় নি? নিশ্চয়ই চাপিয়েছে। কিন্তু সেটা পরবর্তী ইতিহাস। ঐ সময় অসহায় মানুষের 'বেঁচে থাকবার জীয়নকাঠি'র উৎস হিসেবে কাজ করেছে কিন্তু black art—শেকড়-রত্ন-ধাতু তারই অংগ।

এবার বর্তমান যুগের কথা। ভারতবর্ষের ব্যাপক মানুষের জীবন-প্রণালী নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। Stress Analysis দরকার। একটা মানুষ কতোগুলো চাপ একইসাথে সহ্য করতে পারে? একদিকে অন্তঃস্থ চাপ, অপরদিকে বহিঃস্থ চাপ। আর সম্ভবতঃ দারিদ্র্য সবথেকে বড়ো চাপ। আজ সকালটা কিভাবে বাঁচবো, রাতটা আদৌ বাঁচবো কি না—কল্পনা নয়, বাস্তবে উপলব্ধি করলে চাপটা বোঝা যায়। আমরা যেগুলোকে কুসংস্কার বলতে ভালবাসি, সেগুলোই কিন্তু ওদের মানসিক-ভাবে সুস্থ রাখে।

বলতে চাইছি, দরিদ্র মানুষগুলোর অবস্থা একটা সম্পূর্ণ Opitmum Condition-এ দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে থেকে কোনো বস্তুগত যোগান না দিয়ে একে কোনভাবেই পাল্টানো যায় না। প্রথমত পাল্টানো যায় না, দ্বিতীয়তঃ, পাল্টানোটা অন্যায়। অর্থাৎ—গ্রামাঞ্চলে সাপের কামড় অহরহ ঘটে এবং এন্টি-ভেনম্ পাওয়ার সুযোগ নেই। অজস্র ঘটনা জানি, যেখানে জল-পড়ায় রোগী 'বেঁচে' উঠেছে (আসলে অধিকাংশ সাপের বিষ নেই, তাই বাঁচে। মারা যায় মানসিক আঘাতে। জল-পড়া ইত্যাদি ঐ অসহায় মানুষকে ফিরিয়ে দেয় মানসিক শক্তি)। 'কুসংস্কার' ভাঙতে হলে পাল্টা চিকিৎসা-ব্যবস্থা দিতে হবে মানুষকে। না হলে মানুষ শুনেও শুনবে না। আর—যদি শোনে? তাহলে সাপের কামড়ে সে ওষুধ পাবে না, আর জল-পড়াতেও বিশ্বাস করবেনা—অর্থাৎ সে মারা যাবে। কোনটা কাম্য? Optimum অবস্থাটা বোঝা উচিত। যেমন—আমার ঘরে আমি কোথায় বই রাখবো, কোথায় লিখবো, কোথায় রাখবো ফাইলগুলো—এটা একেবারে Optimum হয়ে আছে। বাইরে থেকে কোনোকিছু না এনে কেউ একে বদলাতে গেলে এলোমেলোই করে দেবে। তাতে লাভের ঘরে কিছুই জমা পড়ে না, ক্ষতির পরিমাণ বাড়ে।

আর, গরীব মানুষ ভীষণরকম কুসংস্কার চর্চা করে—কথাটা একদম ভুল। গ্রাম-গঞ্জের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি এ প্রত্যয় পেয়েছি। চাষীর বৌ প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলসীতলায় সন্ধ্যে দেয়, এ দৃশ্য বাংলার কৃষক পরিবারে বিরল। আসলে, ওদের সবটুকু তথাকথিত কুসংস্কার ছড়িয়ে আছে জীবনধারনের অস্থিতে-মজ্জায়। জীবনের প্রয়োজনে যেটুকু সময় দিতে হয়, সেটুকুই ওরা দেয়। সময় ওদের জীবনে অন্যসুরে বাঁধা—আমারা খোঁজ রাখি না বলেই মনগড়া গল্প শোনাই।

শহরাঞ্চলে বা মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তদের জীবনে সংস্কারের এই ভূমিকা হয়তো আর্থনীতিক কারণে নাও থাকতে পারতো। কিন্তু সামাজিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারটা যাবে কোথায়? আজকের শহরগুলো একসময় তো গ্রামই ছিলো বা শহরের মানুষগুলো একসময় গ্রামেরই মানুষ ছিলো। মূলতঃ, প্রচ্ছন্ন অনিশ্চিত কৃষিজীবন থেকে উঠে আসা এইসব বিশ্বাস যুগযুগ ধরে সঞ্চালিত হয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে। হয়ত আজ শহুরে জীবনে সে অনিশ্চয়তা গেছে অনেক কমে। আসলে জীবনযাত্রা যতো অনিশ্চিত হয়, যাদুবিশ্বাস ততো বেশী হয়। শিল্পের থেকে কৃষি অনেকগুণ অনিশ্চিত, তাই কৃষিনির্ভর মানুষের জীবনে এ বিশ্বাস অনেক ব্যাপক, অনেক গভীর।

প্রকৃতপক্ষে, Folk Science নামক একটা বিষয়ের কথা আমি বলতে চাইছি। শ্রমজীবী মানুষ নিজেদের অন্ন-আগ্রয়ের প্রয়োজনে অবিরাম আবিষ্কার করে গেছে। প্রত্যেকটা আবিষ্কার প্রয়োজনভিত্তিক। নৌকা জলে ভাসার তত্ত্ব আর্কিমিডিস নিয়ে আসার প্রায় তিনহাজার বছর আগেই নৌকা জলে ভেসেছে। একই ভাবে বোঝা যায় নিউটনের trajectory, পিথাগোরাসের উপপাদ্য, কৃষিবিজ্ঞান, জেনেটিকস্ অথবা এরোপ্লেনকে। এই ধারণাগুলিকেই তত্ত্বে রূপ দিয়েছে অবসরভোগী বিজ্ঞানীরা—একে বলা যায় Aristocratic Science। আজ আমরা যাকে কুসংস্কার বলে দূরে সরিয়ে দিই, অনেক সময় দেখা যায় তার মধ্যেও থেকে গেছে Folk Science-এর স্পষ্ট ছাপ। ব্যাপক মানুষের আবিষ্কৃত ও প্রয়োজনীয় Folk Scince-এর দৃষ্টিকোণটা বুঝতে না পারলে গোটা ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা হতে বাধ্য॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:—সামগ্রিক ভাবনাটি গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায়, সৌমেন গুহ-র সাথে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি।

সহায়ক বইপত্র

1. Henry Louis Morgan—Ancient Society
2. A. Moret and G. Davy—From Tribe to Empire
3. James Frazer—The Golden Bough
4. M. Winternitz—A History of Indian Literature
5. D. D. Koshambi—An Introduction to the Study of Indian History
6. George Thompson—Studies in Ancient Greek Society
7. Augustus Somerville—Crime and Religious Beliefs in India
8. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—লোকায়ত দর্শন (এক খন্ডে সম্পূর্ণ)
9. ঋগ্বেদ-সংহিতা
10. মহানির্বাণতন্ত্র
11. ছান্দোগ্য উপনিষদ

[এটি কোন পূর্ণাঙ্গ লেখা নয়। 1982 সালের ডিসেম্বর মাসে হাওড়ার মৃদঙ্গ সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় আলোচিত মূল বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার এটি। বহু বিষয়কেই তাই ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। রয়ে গেছে বিতর্কের অবকাশ। 'অন্যচোখে' পত্রিকার মে-আগস্ট 1984 সংখ্যা থেকে লেখাটিকে পুনর্মুদ্রিত করলাম আমরা।

স: ম:, বি. ও. বি.]

'কু-সংস্কার' বিরোধিতা কোন্ পথে ?

সৌমেন গুহ

কয়েকটি প্রদর্শনী, বিজ্ঞান পদযাত্রা, পত্রপত্রিকায় ইদানীং বেশ কিছু 'কু-সংস্কারবিরোধী' বক্তব্য থাকছে। বিষয়টি, ইতিমধ্যে আমাদের একাংশের কাছে একটি আন্দোলনের ভিত্তি বা কর্মসূচী হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

এ ব্যাপারে, 'গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র' ও তার সহযোগী সংগঠন হিসেবে 'বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা', 'উৎস মানুষ' ইত্যাদি 'কু-সংস্কার' বলতে যেগুলি বেছে নিয়েছে তার মধ্যে বিশেষত—মাদুলী-কবচ, রোগ সারানোর ও ভূত-প্রেত ছাড়ানোর তুক্‌তাক্, জ্যোতিষী, আপাত অস্বাভাবিক ঘটনা এবং প্রচলিত 'ট্যাবু,' উল্লেখযোগ্য। বিষয়গুলি কিছুটা জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে—তার একটি কারণ বোধহয়, এগুলির অস্তিত্ব চোখ-কান খোলা থাকলেই দেখা যায়।

প্রশ্নটা এগুলোর অস্তিত্ব নিয়ে নয় (অর্থাৎ কবচ-মাদুলী-ঝাড়ফুঁক আছে কি না, নিয়ে বিতর্ক নয়)—রীতিমতো সন্দেহ থাকে এই অস্তিত্বটার ব্যাখ্যা ও বিরোধিতা কতোখানি 'বৈজ্ঞানিক।'

একটি অ্যাকাডেমিক্ সতর্কবাণী খেয়াল রাখি—পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক আলোচনায় গভীর পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট নেই। আর সাধারণ মানুষের নিজস্ব সাংস্কৃতিক মালমশলার প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ প্রায় শূন্য (প্রকাশিত রচনাবলীর মান ও মাপে)।

এহেন অবস্থায় কোনো বিষয় সম্বন্ধে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্তে আমাদের আসতে গেলে—যতো ছোটোই হোক, ফাঁকগুলো কিছুটা ভরাট করতেই হবে। না হলে এক্সট্রা-অ্যাকাডেমিক বক্তব্য ও আন্দোলন ফাঁক ও ফাঁকিতে ভরে যাবে।

পথ চলতি

বন্দেল গেট থেকে আমাদের বাড়ী পর্যন্ত প্রতিদিন হাঁটতে হাঁটতেও ব্যাপারটা ভাবতে পারি। পথটা মিনিট পাঁচ সাতেকের।

অঞ্চলটা ঘিঞ্জি হয়ে গেছে মূলত বিরাট সংখ্যক বস্তি বাসিন্দায়, যারা পেশায় রিক্সাওয়ালা, দিনমজুর, ছুতোর-কামার ইত্যাদি। সারা রাস্তায় বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্তান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন্ (HDC) এর কারখানা। বাজারে আনাজ-তরকারীর পাশে দুটি হার্ডওয়ারের দোকান, একটি বিরাট ভূষিমালের আড়ৎ, ইত্যাদি।

রাস্তার ওপরে ইদানীং দু'টি শনিপুজোর ঠেক্ হয়েছে—পয়সা পড়ে সপ্তাহে সাতদিন, পুজো হয় শনিবার। রেকর্ড বাজে, ছেলেরা নাচে। একটি দরগা আছে, রোজ খোলা থাকে। ময়ফিল্ হয় বছরে প্রায় পাঁচ-ছটা।

ছিলো একটা ওষুধের দোকান—আরো দু'টো হয়েছে। এই তিনটের একটার মালিক কম্পাউন্ডার থেকে এখন ওষুধের কারখানার মালিক (ভায়া দোকান)—এখন গাড়ী চড়ে। একটির মালিক ডাক্তার—শুধু রোগী দেখা থেকে ওষুধের কারবারী।

বছরে একবার রাসের মেলা হয় রাস্তার ওপর—'রাস-বাড়ী' অর্থাৎ পুরোনো জমিদার বাড়ীকে কেন্দ্র করে। এই 'রাসবাড়ী', পেছনের গোটা ষাটেক পরিবারের বস্তির মালিক।

একটা লাইব্রেরী—সাদামাটা কয়েক শ' বই ও একটা টিভি আছে। সন্ধেবেলা পাড়ার লোক ভীড় করে টিভি দেখে। গোটা দুয়েক দুর্গাপুজো আর তার বেশী কালী-সরস্বতী পুজো হয় রাস্তাটায়। ছেলেমেয়েরা ইউনিফর্ম পরে সাউথ্‌পয়েন্ট আর পাঠভবন থেকে ফেরে। গরীবেরা কাছে কর্পোরেশন্ ইস্কুলে যায়। ফ্যামিলি প্ল্যানিঙের গাড়ী বস্তিতে আসে। গ্যাস্ট্রো-এন্টেরাইটিসের মহামারী ছিলো দু'বছর আগে। দেশী মদ ও ঝাল-তেলেভাজা পাওয়া যায়—সন্ধের পর দু'চারটে লোক মাতাল হয়ে হাঁটে।

বিশদে আর যাচ্ছি না—রাস্তাটা অনেক দিন ধরে দেখে এখন সহজবোধ্য হয়ে আসছে। কয়েকটা এলোমেলো লোকের কাছে পাড়ার নীচতলার গল্প একটু-আধটু শুনতে পাই। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-প্রেম-চাকরী-অসুস্থতা-চিকিৎসা-মাদুলী-ভূত-পুজো ইত্যাদির নানা খবরের এক সামান্য ভগ্নাংশ প্রায় পরিশ্রম না করেই পাওয়া যায়—দরজাটা খোলা রাখলে।

এই ভৌগলিক অংশটিতে, অতএব, লক্ষ্য করা যায়—আমরা যদি বিশেষ 'কু-সংস্কার' খুঁজতেও চাই—

শনি পুজো, তুক্‌তাক্, ভূতের গল্পে সব থেকে কম সময়, শক্তি ও অর্থ বিনিয়োগ করে কর্মঠ মানুষেরা। যেমন, দুটি শনির থানের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি ফুলেফেঁপে উঠেছে ওষুধের দোকানগুলো। কনজিউমারের সংখ্যা ওষুধের দোকানে অনেক বেশী, বিনিয়োগ ও লাভ অনেক বেশী। অন্যান্য উচ্চ-বিত্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একই কথা। এখন যদি কনজিউমারিস্ট পুঁজির হিসেব করে দেখা হয়—ওই 'কু-সংস্কার' মোটেই প্রধান তো নয়ই, এমন কি আর্থনীতিক জীবনে অতি নগণ্য ভূমিকা পালন করে (এমন কি,

নিম্নবিত্তের জীবনেও আপাত উদ্বৃত্ত অর্থ, অন্যান্য সাধ-আহ্লাদ মিটিয়ে এর জন্য পড়ে থাকে)।

এই অঞ্চলের সামাজিক রাজনীতিক কর্মকাণ্ডে এই 'কু-সংস্কারের' কোনো 'say' বা হক্ নেই—চূড়ান্ত ডিফেন্সিভ অবস্থায় থাকে (তাই থানটা শুধু বেঁচে থাকার জন্য ঈশ্বরের দোহাই পাড়ে)। স্থানীয় পার্টি, এম্.এল.এ., মস্তান, পুলিশ ও আড়ৎদাররা এক কথায় সমস্ত সমাজের অভিভাবক (যেমন, শুধু H D C কারখানা মামলা করে নতুন রাস্তা তৈরী বন্ধ করে রেখেছে, বা মিটিং করেও 'রাস বাড়ী'-কে দিয়ে বস্তি-বাসীরা পায়খানা তৈরী করাতে পারে নি)।

সংস্কৃতিক জীবন বলে যদি কিছু থাকে, তা হলে সেখানেও—টাকা পয়সা, ক্ষমতা ও জৌলুসের মাত্রায় এই 'কু-সংস্কার' অঞ্চলের ব্রাত্য। পাড়ার লেখাপড়া, গানবাজনা, স্পোর্টস, খিস্তি, পোষাক ইত্যাদিতে 'কু-সংস্কার' এঁটে উঠতে পারে না—'বড়' দের সঙ্গে (রবীন্দ্রজয়ন্তীতে বা বিয়ে-বাড়ীর উল্লাসে খরচা এ পাড়ায় অনেক বেশী)। অসুস্থতা ও মৃত্যুর কারণ হিসেবে এখানের দারিদ্র্য ও খাওয়ার জল যতখানি দায়ী—'ঈশ্বর' ততখানি ক্ষতি করে নি। দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেকেই ভীষণ সচেতন রোজ-গার আর সংসার দেখাশোনা করতে।

বাকী থাকে—শ্রমের থেকে অবসর, বিনোদন, পরিকল্পনা ইত্যাদির সময়। নিম্নবিত্তদের এটা খানিকটা কম। এ সময়ে দেখা যাবে—টিন্‌টিন্ কমিক্স বা ডাঁই গ্রন্থ পাঠ, কোরানের আওয়াজ, 'সা-রে-গা-মা', মাত্‌লামি, শনি-পুজো ইত্যাদি ইত্যাদি। বেঁচে থাকার প্রত্যক্ষ কাজের থেকেও পরোক্ষ কাজগুলোর মধ্যে (শ্রম-প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন) এই 'কুসংস্কার' দেখা যাবে বেশী—যা এই ভৌগোলিক অঞ্চলের সামগ্রিক আর্থনীতিক, সামাজিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবে একান্ত গৌণ।

দূরের গল্প

1978 সালের ভয়াবহ বন্যায় আরামবাগ থানায় (হুগলী জেলা) গোঘাট ব্লকের 'ঠুঁটোমারি বাঁধ' দেখছিলাম। এই ব্লকটা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। নিজের সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে এটা দেখেছিলাম—দ্বারকেশ্বরের পশ্চিম পারের এই বাঁধটা, পূর্ব পারের সরকারী দীর্ঘ বাঁধের থেকে ছিলো প্রযুক্তিগত ভাবে অনেক অনেক বেশী সঠিক। সমস্ত গ্রাম্য মানুষের চেষ্টায় বাঁধটা তৈরী করে দীর্ঘ দিন দ্বারকেশ্বরকে ঠেকানো গিয়েছিলো। অন্তত ঐ অঞ্চলে সরকারী 'বৈজ্ঞানিক' কাজ ছিলো বন্যায় মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতির জন্যে অধিকাংশে দায়ী।

তবু ঠুঁটোমারি বাঁধ একটি 'ঠুঁটো' বালককে বলি দিয়ে উদ্বোধন করার ঘটনাটা সমর্থন করতে পারি না। কিন্তু বাঁধটা তৈরী হয়েছিলো—গ্রামীণ মানুষ আর মালমশলা মিশিয়ে একেবারে নিখুঁত। নরবলি ছিলো একটি গৌণ আচার মাত্র। ওই অঞ্চলে কোনো সরকারী কর্মকাণ্ড দেখি নি—'ঠুঁটোমারি বাঁধ' তৈরীর থেকে অধিকতর 'বৈজ্ঞানিক'।

ভৌগোলিক অঞ্চল বেছে নেওয়া ছাড়া—প্রথমেই পর্যবেক্ষণের কোনো শুরু খুঁজতে পারছি না।

এমনি একটি অঞ্চল সুন্দরবন। যাতায়াতের পথ, জমির অবস্থা ইত্যাদির হিসেবে বোধ হয় নিকৃষ্টতম অংশ পশ্চিমবঙ্গের এই দক্ষিণাঞ্চল। কলকাতার মাছের বাজারের বড় ভাগ আসে সুন্দরবন থেকে। আর আসে মধু ও কাঠ। জেলে, কাঠুরে ও মৌলেদের প্রধান বিপদ তিনটি—বাঘ, ডাকাত ও ফরেস্ট অফিসের ঝামেলা।

সাপ এদের নিত্যসঙ্গী—ভালই চেনে বিষধর ও নির্বিষ। আর অকারণে খুব ভয় পায় তাও দেখিনি। বিস্তীর্ন অঞ্চলে আছে বিরাট বড়লোক গোসাবার এক ডাক্তার - সকলে 'কাটি-ঘা' নিয়ে আর বাঘের ঘা নিয়ে পারলে এখানেই আসে। এ অঞ্চলে নৌকা ছাড়া গতি নেই—তাই বেশীর ভাগ মানুষ থাকে বিচ্ছিন্ন, নিজেদের এলাকায় আবদ্ধ, সম্পৃক্ত।

অঞ্চলের লোকেরা কী পরিমাণে গোসাবার ডাক্তারকে দেখাতে আসে, তা বোঝা যায় এটা দেখলে— ডাক্তারবাবুটি দীর্ঘদিন ধরে ওখানেই থেকে একাই গোসাবায় বড় বড় বাড়ীর মালিক, স্থানীয় প্রজেক্ট টাইগার, স্টেট্ ব্যাঙ্ক ও BDO অফিসের বাড়ীওলা, প্রত্যেক রাজনীতিক পার্টির অস্তিত্বের বিধায়ক, গোসাবার হ্যামিল্টন সাহেবের ট্রাস্টীর অংশীদার এবং কলকাতায় কয়েকটি বাড়ীর মালিক। সব সোনাই ফলেছে—যখনই স্থানীয় লোক তুকতাকের পরিবর্তে 'চিকিচ্ছে' করিয়েছে।

সুন্দরবনের জেলেরা দল বেঁধে মাছ ধরতে বেরোয়—প্রায় বারো তেরোটা নৌকার 'সাঁই' নিয়ে। জঙ্গলে প্রধানত বাঘের ভয়ের জন্য—সাথে থাকে একজন করে 'গুনীন' বা 'বাওলে'। এরা মন্ত্র দিয়ে বাঘ আটকায় বা বাঘের অস্তিত্ব টের পায়। তা ছাড়া জঙ্গলের ভেতরে আছে (বাইরেও) 'বনবিবির থান'। বনবিবিও নিরাপত্তার দেবী।

'বাওলে' বলতে এখনও জীবিত কয়েকজন যা আছে—সবাই সমান 'মিথ্' হয়ে যায়নি। আমীর আলির মৃত্যুস্থান দেখেছি, যেখানে বাঘে খেয়েছে—আমীর কিন্তু একবারে রূপকথার লোক ছিলো! তবুও আমীর আলিকে বাঘে খেলো, লোকে এ গল্পটাও শ্রদ্ধার সঙ্গেই করে। বাওলে ব্যবস্থার মন্ত্র-তন্ত্র কতোখানি কাজ করে, তার থেকেও বড়ো প্রশ্ন—একজন পেশাদার সিকি-উরিটি গার্ড (বিশেষত জঙ্গল সম্বন্ধে দক্ষ) একান্ত প্রয়োজন হয় জঙ্গলে মাছ ধরতে গেলে। এখনও 'মিথ্' হয়ে আছে যে দু'একজন এরকম বাওলে তারা অসাধারণ শিকারী এবং জঙ্গল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। অবশ্যই সবাই নয়। কিন্তু, মাছ ধরার মুহূর্তে জেলেরা যে অসতর্ক থাকে, এটার ঘাটতি পূরণ করার জন্য দক্ষ বা অদক্ষ বাওলে থাকা খুবই স্বাভাবিক পদ্ধতি। কাজেই, বাওলেদের ও জঙ্গলের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সূত্রে পাওয়া পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হয়েছে—গুনীন বা বাওলেদের তুক্‌তাক্, মন্ত্রতন্ত্র মোটেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় নয়। তদুপরি, এই মন্ত্রতন্ত্রের ওপর বিশ্বাস কোনও ক্ষতি তো করেই না, বরঞ্চ সবথেকে ভালোভাবে

প্রযোজ্য একটা পদ্ধতির জন্ম দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ডি. ডি. কোশাম্বীর একটি জেনেটিক্স্-এর উপর গবেষণা-পত্রের কথা মনে পড়ে যায়। কোশাম্বী 'শম্ভু' বা ধর্মের ষাঁড়, যাকে যৌথভাবে লোকে খাইয়ে তাগড়াই চেহারা করে তোলে, তার সম্পর্কে লক্ষ্য করেছেন যে এই ষাঁড়টিকে ব্যবহার করা হয় সুস্থ, সবল গোবংস প্রজননের জন্য। শুধু ধর্মের ছাপটি থাকার জন্য যৌথভাবে এই উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাটির পত্তন করা সম্ভব হয়েছিলো।

টুসু না তুষু না তুষতুষ্‌লী, ধানের তুষের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা—এই বিদগ্ধ আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না। বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, অখ্যাতনামা থেকে বিখ্যাত চোয়াড় বিদ্রোহের অঞ্চল পর্যন্ত, বছরে একবার, সারা পৌষমাস জুড়ে সাধারণ মানুষের ইচ্ছা-আশা-আকাঙ্খা-দুর্দশা-বিদ্রূপ-প্রতিবাদ, এসব কিছুকেই প্রকাশ করে টুসু উৎসবের গান। একটি মাস—সবথেকে নীচের তলার মানুষ শতশত গান দিয়ে তাদের মেয়ে বা মা টুসুর কাছে প্রাণভরে কথা বলে। এমন কি, উৎসবের নানা অঙ্গে, বিশেষত সংক্রান্তিতে ভাসানের দিন, বিশেষ কোনো ধর্মাচারের নিয়ম না মেনে—হাজার হাজার মানুষ প্রাণ খুলে নিজেদের প্রকাশ করে।

টুসু টোটেম্ না ট্যাবু? টুসু সুসংস্কৃতি না কুসংস্কার? টুসু বৈজ্ঞানিক না ভাঁওতা?

'কুসংস্কার' কু নাও হতে পারে। এমন কি 'কুসংস্কার' সু-ও হতে পারে। 'কুসংস্কার' সংস্কার হিসেবেই অস্তিত্বহীন বহু জায়গায়—হয়তো সেটাই সবথেকে উপযুক্ত জীবনপদ্ধতি।

আবরণ ও প্রতীক

লোকগোষ্ঠী তাদের অভাববোধ, প্রয়োজন, দুঃখ-দুর্দশা, প্রতিবাদ ইত্যাদি প্রকাশের একটি বিশেষ ধরনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এই ধরনটিতে অনিবার্যভাবে থাকে বিশেষ কয়েকটি আবরণ ও প্রতীক (mask and symbol)। আপাতভাবে আমাদের যেগুলোকে নিতান্ত অর্থহীন বা ধর্মীয় আচার বলে মনে হয়, সেগুলোর আবরণ ও প্রতীককে বোঝা বাইরে থেকে খুব কঠিন। শুধু লোকগীতির প্রতিবাদী চেতনার ক্ষেত্রেও এ বিষয়ে আধুনিক গবেষণা প্রচুর (John Lovell, Alan Lomax, John Greenway, A.L. Lloyd ইত্যাদিদের গবেষণায়; প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য Alan Lomax-এর Folk Song Style & Culture বিষয়ক গবেষণার প্রকাশক American Association for the Advancement of Science)। দেখা গেছে—

Go Down Moses, Gospel Train, Steal Away to Jesus, O' Freedom ইত্যাদি চিরায়ত গানগুলি ঈশ্বর বা স্বর্গের আবরণে নিগ্রোদের সবথেকে জঙ্গী আন্দোলনের প্রেরণাস্থল। এ দেশে পরিপূর্ণ ভুল ধারণা বিরাজমান, অ্যাকাডেমিক্ ও এক্স্ট্রা-অ্যাডেমিক্ গবেষকদের লোকবিচ্ছিন্নতা ও মূর্খতার জন্য।

এখন সার্বিক প্রসঙ্গটা হলো, একটি টুসু পরব, বাহা পরব, বা করম নাচ, এগুলির মধ্যে অযথা কুসংস্কার, ম্যাজিক, ঈশ্বরবিশ্বাস খোঁজার পরিবর্তে খুব তলিয়ে, বর্তমান মানুষ এগুলির মধ্যে দিয়ে কী প্রকাশ করতে চায়—সেটা খোঁজা আশু প্রয়োজন। অর্থাৎ, ছোট ছোট ব্রত, পরব, লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষ যে নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী ও মাধ্যম গড়ে তুলেছে, সেগুলিকে ভাঙার বদলে বোঝা ও রক্ষা করা, আমাদের দায়িত্ব ছিলো।

কিন্তু আমরা তা করি নি। যার ফলে, এলিটিস্ট প্রকাশভঙ্গীটিকে প্রাধান্য দিয়ে অবিরাম লোকগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছি সেন্সরের বোঝা। এটা কতোখানি বৈজ্ঞানিক?

বল, না জ্যামিতি?

বহুদিন আগে পড়া একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞানের (সম্ভবত লিঙ্কন্ বার্নেট্-এর Universe and Dr. Einstein) বইয়ের একটি উদাহরণ—জমির ওপর একটি গোলককে গড়িয়ে দেওয়া হলো। অনেক উঁচু একটি টাওয়ারের মাথা থেকে নিচের দিকে এক ব্যক্তি (নিউটন্) তাকিয়ে দেখছে—বিভিন্ন বলের (force) ঘাত-প্রতিঘাতের জন্য গোলকটির গতিপথ আঁকা-বাঁকা হচ্ছে। দ্বিতীয় একজন ব্যক্তি (আইন্স্টাইন্) জমির ওপরে দাঁড়িয়ে দেখবে—জমির উঁচুনিচু জ্যামিতিক চরিত্রের জন্যই গোলকটির গতিপথ আঁকাবাঁকা।

কলকাতার রাস্তায় ট্যাক্সি চড়ে দেখেছি, রাস্তার পদযাত্রীদের ভীষণ বিশৃঙ্খল, অজ্ঞ, অসচেতন ইত্যাদি! কিন্তু, বেশিরভাগ সময় নিজে হাঁটলে তা মনে হয় না!

একটি লোকজীবনের নিজস্ব জীবনচক্রের একই স্তরে না থাকলে সবসময়েই মনে হবে—চেতনা বা সংস্কার-কুসংস্কার তাদের জীবনের গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর ঠিক এখান থেকেই 'নিউটনিয়ান্ বিজ্ঞান' আন্দোলনের শুরু।

যে পথে ন্যূনতম বাধা

কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচীতে আমার আপত্তি নেই, আপত্তি কর্মসূচীর অতিরিক্ত দাবীতে। অর্থাৎ, যখনই কোনো একটি কুসংস্কারকে বাছা হয়, প্রায়শঃই দাবী করা হয় লোকজীবনের সামাজিক-আর্থনীতিক অস্তিত্বে সেটি গুরুত্বপূর্ণ! অথচ সত্যিই আর্থনীতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বা সামাজিক নিয়ন্ত্রক হিসাবে ফুটপাথের বা মন্দিরের জ্যোতিষী, মাদুলী-কবচ বিক্রেতারা নিঃসন্দেহে দুর্বল। বা, কলকাতার ITF প্যাভিলিয়নে কোনো ফান্-ফিয়েস্তার থেকে সতী মায়ের মেলা অনেক, অনেক বেশি দুর্বল। যেমন, যদি তুলনা করি—

ন্যাবা বা জন্ডিসের মালা	Neurobion ইন্‌জেকশন্‌
(1) অতি সাধারণ উপাদানে বিশেষ কায়দায় গাঁথা হয়।	(1) শুধুমাত্র ভিটামিন B_1, B_6, B_{12} এই তিনটির মিশ্রণ।
(2) ন্যাবা বা জন্ডিসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।	(2) নার্ভের অসুস্থতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।
(3) মালা বেড়ে ওঠার চালাকির জন্যে লোকে ঠকে এবং তাই ন্যাবার মালা 'মিথ্‌'!	(3) ডাক্তাররা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলে চালায়, এবং নামটিও একটি মিথ্‌।
(4) দাম সামান্য।	(4) দাম বেশী।
(5) তৈরী করে স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত।	(5) তৈরী করে বড়ো ওষুধের কারখানা।
(6) মালার উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ প্রতিষ্ঠান।	(6) শুধু একটি উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হতে পারে না।
(7) ন্যাবা রোগটি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য।	(7) নার্ভের রোগ অপেক্ষাকৃত দুর্বোধ্য।
(8) ক্রেতার সংখ্যা বেশি, সাধারণত অশিক্ষিত।	(8) ক্রেতা বিশ্বব্যাপী, অশিক্ষিত-শিক্ষিত সবাই।

তুলনা করলে দেখা যাবে—ন্যাবার থেকে অনেক বৃহৎ প্রতারণা জড়িয়ে রয়েছে নিউরোবায়ন্‌ ওষুধটির সাথে। তবুও, ন্যাবার মালা প্রথম আক্রান্ত হবে, তার কারণ বোধহয়—এটার বিরুদ্ধে কথা বলা অনেক সহজ, কম ঝুঁকি ইত্যাদি। এপথে বাধা ন্যূনতম। তাতেও আপত্তি ছিলো না যদি কোনো সময় দুর্বল (weak) ও শক্তিশালী (Strong) প্রতারণা শ্রেণী-বিভাগ করে, কুসংস্কার-বিরোধী আন্দোলন হতো। অভিজ্ঞতায় দেখা যাবে (অন্তত আমার তাই হয়েছে) জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণীর জন্যে কোনো ঘোরতর বিশ্বাসীও ব্যবহারিক কাজেও বসে থাকে নি। পলার আঙটি ধারণকারী অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রম করছে আঙটির দোহাই দিয়ে, এটা দেখি নি। তফাতটা হলো—একজন জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করে, হয়তো আর একজন অর্থনীতিবিদ বা রাজনীতিক অভিভাবককে বিশ্বাস করে।

ঠিক উল্টোটাই দেখা গেছে—এদেশের উপজাতীয় আন্দোলন বা আমেরিকান্‌ নিগ্রোদের আন্দোলনে। ভাগ্যকে (আঙটি বা স্বর্গে) বিশ্বাসীরা অনেক বেশি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিরোধী হয়। কারণ, তারা প্রথমত অবিশ্বাস করে বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা রাষ্ট্রপ্রধানদের। এ ব্যাপারে আমরা ভারতের (বা বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের) বিভিন্ন উপজাতীয় সংস্কৃতির ব্যবহারিক উদাহরণকে খতিয়ে দেখতে পারি।

ডাইনি বলে, ধর্মাচার বলে মানুষকে খুন করা সম্পূর্ণ বিরোধিতা করার ইচ্ছাটি তখনই সামাজিক ভাবে সার্বিক গুরুত্ব পায়—যখন, মানুষকে হত্যা করার সমগ্র ব্যবস্থাগুলিকেই প্রতিবাদের বা সমালোচনার বিষয় হিসাবে আমরা বেছে নিতে পারি। কল্যাণীর সতী মায়ের মেলায় ধর্মাচারের নামে যে শারীরিক নির্যাতন চলছিলো, সমগ্র কল্যাণীর 365 দিনের নির্যাতনের সেটি কতো ভগ্নাংশ? তফাতটা হলো—কল্যাণী থানার নির্যাতনের বিরুদ্ধে কথা বলাটা অতো সহজ নয়—যদিও নির্যাতিতের মৃতদেহ প্রকাশ্যে গাছের ডালে ঝোলে!

অর্থাৎ, কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনে বর্তমান কর্মসূচীর বেশির ভাগটিই নিজের শক্তি নিহিত করছে কোনো একটি ভৌগোলিক বা সামাজিক সীমানার দুর্বলতম ঘটনাবলীতে।

সচেতনতা কতোখানি?

যদি আমরা দেখি বিশেষ কয়েকটি গৌন ঘটনা সম্পর্কে ঘটা করে আমরা অনেক বলতে পারছি, লিখতে পারছি—যেটাকে দৈনন্দিন জীবনে বৃহত্তর লোকগোষ্ঠী আমলই দেয় না—তখন আমরা কাদের থেকে বেশি সচেতন (Aron-এর আলোচিত খাতিরপাওয়া ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের মতো অবিরাম গৌণ বিষয়কে জটিল করা, সাধারণ আলোচনাকে বিমূর্ত করে তোলা এবং মূলত কোনো ব্যবহারিক উন্নয়নের কর্মসূচীতে মাথা না ঘামানোর Opium of Intellectuals)?

জনগণকে সচেতন করে তোলা—কী বিষয়ে, কাদের? কৃষক, শ্রমিক বা বুদ্ধিজীবীদের নিজস্ব বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রয়োজনীয়তা কখন্‌ আমরা বোধ করি? এক বা একাধিক বিষয়ে দুটি মানুষ পরস্পরের জ্ঞানের ঘাটতি সহযোগিতার মাধ্যমে মেটাতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান আন্দোলনকারী আমরা যদি মনে করি, আমাদের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ 'সচেতন' হবে (যাদের কাছে জ্যোতিষীর ভাঁওতা বোঝাই, তাদের কাছ থেকে আমরা চাষের পদ্ধতি জানতে আগ্রহী নই)—এই উচ্চমন্যতাবোধ জনবিচ্ছিন্নতা শুধুই বাড়াবে। আমি নিজে একাধিক বিজ্ঞান ক্লাবের সম্মেলনে দেখেছি, আশ্চর্যরকম ভাবে সেগুলি উচ্চমন্যদের নিজস্ব মঞ্চ। ক্রমশই, উচ্চমন্যদের মঞ্চ প্রসারিত হয়ে চলবে, লোকগোষ্ঠীর নিজস্ব বিশ্লেষণ ধামাচাপা পড়বে (এই ধরনের 'সচেতনতা বৃদ্ধির আন্দোলনকে সমাজতাত্ত্বিক Peter L. Berger বলছেন cognitive imperialism)।

একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের মুখোমুখী হতে হয়—সাধারণ মানুষকে সচেতন ও সবাক করে তোলার চেষ্টা তাদের আশু শোষণকারী ও প্রতারকদের বিরুদ্ধে, এবং 'শিক্ষকদের' নিজস্ব শোষণ, শোষকারী, প্রতারণা ও প্রতারকদের বিরুদ্ধে নির্বাক থেকে!

ঠিক এটাই চলতে থাকলে, হয় তো কিছু দুর্বল কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর জনসাধারণকে শক্তিশালী কুসংস্কারের বলি হিসেবে তৈরী করে নেওয়া যাবে।

আর সমাজ বিকাশের সামগ্রিক ইতিহাসটাই তাই!

একটি সম্ভাবনা

একটি বিশেষ অঞ্চল বা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর জীবনধারণের আর্থনীতিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক খুঁটিনাটি যদি প্রথম জানা যেতো, এই জীবনধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তুর প্রভাব ও চিন্তার পরিমাপ যদি করা যেতো, আমাদের নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী একটি বা দুটি বস্তু সম্পর্কে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা যদি চলতো, যদি আমরা ভাবনা ও পুনর্ভাবনা দিয়ে সেই আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করতাম—তাহলে 'কুসংস্কার' বিরোধী আন্দোলন পায়ের তলায় শক্ত জমি পেতো।

আর—ঠিক এ ধরনের আলোচনা বা চেষ্টা আশ্চর্যজনকভাবে 'কুসংস্কার' বিরোধী রচনা ও আন্দোলনে অনুপস্থিত—এখনও॥

জানবার কথা

আন্ত্রিক রোগের জীবাণুর শ্রেণীবিভাগ

1896 সালে জাপানী জীবাণুবিদ ডঃ শিগা প্রথম আন্ত্রিক রোগের জীবাণুর প্রকৃত তথ্য জানান। তাঁরই নামানুসারে এই জীবাণুগোষ্ঠীকে শিগেলা গোষ্ঠী বলা হয়। ডঃ শিগা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যে বিশেষ শ্রেণীর জীবাণুর সন্ধান দিয়েছিলেন—সেটিকে বলা হয় Shigella dysenterica (সংক্ষেপে S. dysenterica)। তারপর এই গোষ্ঠীর আরো কয়েকটি শ্রেণীভুক্ত জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে, যেমন S. flexneri, S. boydii, S. sonnei, ইত্যাদি।

পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রতিক ব্যাপক আন্ত্রিক মহামারীর কারণ খুঁজতে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের দুটি দল দুরকম বক্তব্য রেখেছেন। একটি বক্তব্য, এই মহামারীতে আক্রান্তদের ভিতর শতকরা প্রায় একশ ভাগই S. dysenterica 1-এর শিকার; আবার অন্য বক্তব্য অনুযায়ী S. dysenterica 1-কে মাত্র শতকরা 10 থেকে 12 টি ক্ষেত্রে দায়ী করা চলে। আন্ত্রিক মহামারীর মোকাবিলা করতে হলে যেমন ব্যাপক মানুষের কাছে পর্যাপ্ত ও পরিষ্কার জল সরবরাহ করা দরকার, মৌলিক স্বাস্থ্যবিধিগুলি পালিত হওয়া দরকার, তেমনই দরকার আক্রমণকারী জিবাণুটিকে ঠিকমত সনাক্ত করা। কারণ আক্রান্ত রোগীর প্রতি প্রযুক্ত চিকিৎসাব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ভর করে অনেকটাই এর উপর। তাই জানতে ইচ্ছা করে, আমাদের সাম্প্রতিক মহামারীর ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য যে বিষয়টি নিয়ে সেটা ঠিক কি ব্যাপার—শিগেলা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি শ্রেণী S. dysenterica; তার আবার type 1 বলতে কি বোঝায়?

শিগেলা গোষ্ঠীর যে কোনো শ্রেণীর জীবাণুগুলিকে আবার কয়েক উপশ্রেণী বা 'সিরোলজিক্যাল টাইপ-এ ভাগ করা যায়। যেমন S. dysenterica (A শ্রেণী) 10 টি, S. flexneri (B শ্রেণী) 6-টি, S. boydii (C শ্রেণী) 15-টি এবং S. sonnei (D শ্রেণী) 2টি উপশ্রেণীতে বিভক্ত। A শ্রেণীর উপশ্রেণীগুলিকে যথাক্রমে S. dysenterica 1, 2, ইত্যাদি সংকেতের সাহায্যে বোঝানো হয়। প্রতিটি উপশ্রেণীর কোষপ্রাচীরের গঠনের তারতম্য আছে, এবং তার ফলে ঐ জীবাণু যখন 'অ্যান্টিজেন' হিসেবে কাজ ক'রে অ্যান্টিবডি তৈরী করে, তখন বিভিন্ন উপশ্রেণীর ক্ষেত্রে উদ্ভূত অ্যান্টিবডিতেও তফাৎ থেকে যায়। S. dysenterica 1 যে অ্যান্টিবডি তৈরী করবে সেটা S. dysenterica 1 অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এলে শতকরা একশ ভাগ ক্ষেত্রেই দলা পাকিয়ে যায়। এই বিক্রিয়াকে বলা হয় অ্যাগ্লুটিনেশন। S. dysenterica 2-এর অ্যান্টিবডি কিন্তু S. dysenterica 1 অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এলে শতকরা একশ ভাগ ক্ষেত্রে দলা পাকায় না, অর্থাৎ অ্যাগ্লুটিনেশনের মাত্রা সেখানে কিছুটা কম। এইভাবে এক উপশ্রেণীর অ্যান্টিজেন আর অন্য উপশ্রেণীর অ্যান্টিবডির ভিতর cross reactivity-র মাত্রা বিভিন্ন হয়ে থাকে। পরীক্ষার সাহায্যে এই মাত্রা নির্ণয় করে 'সিরোলজিক্যাল টাইপ' সনাক্ত করা সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তর 1948 থেকে 1964 সাল, এই ক'বছর ধরে যে সমীক্ষা চালিয়েছিল তার কিছু তথ্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, শতকরা মাত্র দুই থেকে চার শতাংশ ক্ষেত্রের জীবাণু S. dysenterica শ্রেণীভুক্ত, এবং তার ভিতর টাইপ 1 আর 2-এর আক্রমণই প্রায় সর্বত্র। শতকরা সত্তর থেকে পঁচাত্তরটি ক্ষেত্রে রোগাক্রমণের জন্য দায়ী ছিল S. flexneri; এর আবার ছয়টির ভিতর দুটি টাইপের প্রাধান্য বেশী। উল্লিখিত সমীক্ষায় সিগেলা গোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণী, উপশ্রেণী, এবং তাদের আবার আরো বিশদ শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধরনের পরিবারের জীবাণুদের আনুপাতিক প্রাদুর্ভাব সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল।

এই ধরনের বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে মনে হয়, আমাদের এখানে S. dysenterica 1 প্রায় একশ ভাগ রোগাক্রমণের জন্য দায়ী, এরকম দাবী খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে পরিমাণের বিচারে কম হলেও S. dysenterica-কে মোটেই উপেক্ষা করা চলে না, কারণ এটির আক্রমণই সব চাইতে মারাত্মক।

আমাদের সাম্প্রতিক মহামারীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা যে সব তথ্য বলেছেন সেগুলি কি উপযুক্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে পাওয়া? যদি তাই হয়, তবে তাঁদের বক্তব্যে এত তফাৎ কেন?

রঞ্জন ভদ্র

দৃষ্টিকোণ

বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসঙ্গে

বিজ্ঞানমনস্কতা সম্পর্কিত আলোচনাটি বি. ও. বি জানু-ফেব্রু পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। 1984 সংখ্যা দ্রষ্টব্য এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ অথচ বহুলাংশেই অবহেলিত একটি বিষয় নিয়ে চর্চা পাঠক হিসেবে আনন্দ দিলো।

বিজ্ঞানমনস্কতার উপর ছোট আলোচনায় মূল বিষয়টি ধরা পড়লেও দুটি দিক থেকে বিজ্ঞানমনস্কতার ধারণাটি পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে।

প্রথমতঃ আমাদের বিজ্ঞানচর্চায় নিরপেক্ষ বিজ্ঞান বা neutral science কথাটা বলার যথেষ্ট রেওয়াজ আছে। বিজ্ঞানের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে একটি মূল নিরপেক্ষ বিষয়নিষ্ঠ দিক থাকে নিশ্চয়ই কিন্তু এই neutral science কথাটা অনেক সময় সঠিক বিজ্ঞানমনস্কতা বিরোধী। তাই এই শব্দটি কোথায় কি ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা দেখা প্রয়োজন। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের military science বা অন্যান্য big science এর জন্য প্রচুর ডলার ব্যয় হয় আর বলা হয় এটি neutral science, সুতরাং সকলের বিজ্ঞান, সকলের জন্য বিজ্ঞান। এই জায়গা থেকে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী কে গুলিয়ে দেওয়া হয়। অথাৎ আমাদের মনে রাখা দরকার উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের স্বার্থেই বিজ্ঞান বিকশিত হচ্ছে, এখন তাই বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ neutral বলার অভ্যেস ত্যাগ করা প্রয়োজন। কেননা বিজ্ঞানমনস্কতা ব্যাপারটা শধুমাত্র বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নয়, বিজ্ঞানের বইরের প্রশ্নে, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের (end) সাথে সংযুক্ত। সুতরাং বিজ্ঞানমনস্কতার ধারণাটি শ্রেণী নিরপেক্ষ হতে পারে না। তার মনে আমি অবশ্যই বলছিনা Marxist Physics বা Marxist Chemistry এই জাতীয় একটা ব্যাপার হোক। বিজ্ঞানের Specialised এবং সৃজনশীল একটা দিক থাকবেই কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনস্কতা শুধু একটা বস্তুনিষ্ঠ ব্যাপার নয়, এটা একটা জীবনচর্চা।

দ্বিতীয়তঃ আজরের দশকের বিজ্ঞানের একটি গভীরতম সংকট Philosophi-less-ness, অথচ বিজ্ঞান তার সিলেবাস ছাড়িয়ে যখন জীবনচর্চায় এসে পড়ে তখন এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গী, একটা জীবনচর্চা হয়ে দাঁড়ায়। আলোচনাটিতে বলা হয়েছে বিজ্ঞানমনস্কতার অন্তর্ভুক্ত গভীর ভাবাবেগ ও একটিসৌন্দর্য বোধও এর অন্তর্গত। প্রসঙ্গত বলি, শুধুমাত্র সৌন্দর্য বোধ নয় নৈতিক মূল্যবোধকে বাদ দিয়েও এই মনস্কতা গড়ে উঠতে পারে না। আজ আমরা শুনছি সারা বিশ্বের প্রথমস্তরের কৃতী বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের প্রায় 40 শতাংশ সামরিক গবেষণায় নিযুক্ত; 1967 থেকে 1972 এই কয়েক বছরের মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন উন্নয়নশীল দেশ থেকে যে পরিমাণ মেধা-চালান (Brain Aid) পেয়েছে তার অর্থ মূল্য হোলো 2,40,000 কোটি ডলার। এ থেকে একটা নৈতিকতার সংকট কি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনা?

এ কথা জলের মত স্বচ্ছ একটা নির্দিষ্ট বস্তুবাদী দর্শন ছাড়া বৈজ্ঞানিক মনস্কতা তৈরী হতে পারে না। এঙ্গেলস্ তাঁর Dialectics of Nature-এ উদ্ভিদ ও প্রাণীতত্ত্ববিদ আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্রুকস্ কি ভাবে অগভীর নিরীক্ষণ ও যুক্তির সামগ্রিক সামাঞ্জস্য না থাকায় আত্মার বুজরুকদের পাল্লার পড়েন তা দেখিয়েছেন। লেনিনও দেখিয়েছিলেন দ্বন্দ্ববাদ সঠিক অনুধাবন না করার জন্য বহু বিজ্ঞানী ভাববাদী বিচ্যুতির শিকার হন এবং বিজ্ঞানমনস্কতা হারান। বহু বিজ্ঞানী আছেন যারা material obviousness থেকে বস্তুবাদের মূলপ্রত্যয়কে স্বীকার করে গবেষণা চালাচ্ছেন কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে চরম ভাববাদিতা দেখাচ্ছেন। এই মানসিকতাকে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বা বিজ্ঞানমনস্কতা বলা যায় না। সুতরাং সঠিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বা বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে উঠতে পারে না। বিজ্ঞানের একটি মূল দর্শনের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত।

সবশেষে একথাও বলা প্রয়োজন, আমরা যারা সাধারণ মানুষ তাদের বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা আরো কঠিন এই জন্য যে আমরা দেখি বিখ্যাত মহাকাশচারী বোরম্যান, লোভেল, স্যান্ডারসন মহাকাশে যাবার আগে বাইবেল পাঠ করছে। আইনস্টাইন স্পিনোজার ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাস করছেন। সুতরাং প্রকৃত সৎ বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানকর্মীরা এই বিজ্ঞানমনস্কতার চর্চা সমান্তরাল ভাবে গড়ে তুলতে না পারলে সাধারণ মানুষ আরো দিশেহারা হবে।

জয়ন্ত ঘোষাল

মাসিক

গণস্বাস্থ্য

পোঃ নয়ারহাট/ঢাকা/বাংলাদেশ

সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের পত্রিকা। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত। জনস্বাস্থ্য বিষয়ে এ ধরনের পত্রিকা হয়তো আগে পড়েননি।

উপরের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলের দোকান কথাশিল্প, বুকমার্ক এবং বুকস এ্যান্ড নিউজ-এ খোঁজ করুন।

With best compliments from

PHILLIPS CARBON BLACK LIMITED

'DUNCAN HOUSE'
31, Netaji Subhas Road
CALCUTTA-700001

বিশ দফার নানান ফল

গাঁয়ে গাঁয়ে বিজলী-জল

বি 83/441

R.N.34929/79

VIGYAN-O-VIGYANKARMI
c/o D.S. Enterprise,
52/9C B.B. Ganguli Street, Calcutta-12
MAY-JUNE 1984

YEAR 7 NUMBER 6

পড়ুন ও পড়ান

☐ উৎস মানুষ ☐ প্রগতিবার্তা (কল্যাণী) ☐ বিজ্ঞান মণীষা (মেদিনীপুর) ☐ অঙ্কুরে গুরু ☐ লোকবিজ্ঞান (কাশীনগর) ☐ অন্বেষা ☐ অহল্যা ☐ গণস্বাস্থ্য (বাংলাদেশ) ☐ Manushi (দিল্লী) ☐ Parents and Pedagogues (উড়িষ্যা) ☐ Science for the People (USA) ☐ Medico Friends' Circle Bulletin (পুণে) ☐ জনবিজ্ঞান (আসাম)।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা

☐ মনোরোগ, মনোরোগী, মনোচিকিৎসা ও একটি নতুন পথের খোঁজে ('উৎস মানুষ' ও 'মানস' এর যৌথ উদ্যোগে প্রচারিত ও মুদ্রিত, যোগাযোগ P 239 A কিষ্বার স্ট্রীট, কলিকাতা—700017) ☐ কল্যাণী ঘোষপাড়ার সতীমার মেলা ও কর্তাভজা সম্প্রদায়—মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার, 23 চাঁদমারী রোড, কাঁচরাপাড়া) ☐ মালা বাড়ে রোগ সারে—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (উৎস মানুষ, বি ডি 494 সল্ট লেক, কলি64) ☐ গণবিজ্ঞান আন্দোলন কি ও কেন, একটি প্রাথমিক খসড়া—মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (অমূল্য মণ্ডল কর্তৃক বি6/119 কল্যাণী, নদীয়া থেকে প্রকাশিত) ☐ পরিবেশ দূষণ—স্বপন কুমার শীল (কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার) ☐ না হিরোসিমা নাগাসাকি চাই না (দ্বিতীয় সংস্করণ) সৌমেন গুহ (পঃ বঃ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা) ☐ হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান (বি-ও-বি সংকলন, পঃ বঃ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা) ☐

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী কোথায় পাবেন

☐ কলেজ স্কোয়ারের বইয়ের দোকান কথাশিল্প, বুকমার্ক, পিপ্‌ল্‌স বুক সোসাইটি, বুক্‌স অ্যাণ্ড নিউজ ☐ শিয়ালদহ নর্থ স্টেশন ☐ বি বি ডি বাগের স্টল ছাড়পত্র, এমা ☐ শ্যামবাজার ও রাসবিহারী মোড়ের স্টল ☐ রাজা রামমোহন রায় সরণী, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের উল্টোদিকের বইয়ের দোকান 'নবসাহিত্য প্রকাশনী' ☐ এবং অন্যান্য।

রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে গীতা প্রিন্টার্স, ২১, পঞ্চানন ঘোষ লেন কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত